পিংকি ও অলৌকিক বাবা

প্রবীর ঘোষ



পিংকি ও অলৌকিক বাবা

পিংকি ও অলৌকিক বাবা

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯৭, এপ্রিল, ১৯৯০

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী
অলংকরণ : দেবব্রত নন্দী ও পিনাকী ঘোষ

দাম : ১৫·০০ টাকা
Rupees Fiften Only

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে : দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
মুদ্রাকর : বিশ্বনাথ পাত্র : সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন : কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রীপথিক গুহ

প্রিয়বরেষু

পিংকি ও অলৌকিক বাবা

লেখকের অন্যান্য বই :

অলৌকিক নয়, লৌকিক

বিশ্ব ক্যুইজ

অলৌকিক কিছুর ব্যাখ্যা পেতে একটি জবাবী খামসহ
লিখুন এই ঠিকানায়—

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড

কলকাতা ৭০০ ০৭৪



পিংকি ও অঘোরবাবার কাণ্ডকারখানা

আজ ১৩ অক্টোবর ১৯৮৩, বৃহস্পতিবার, মহাসপ্তমী।

সকাল বেলা দাঁত মাজতে মাজতে পিংকি হঠাৎ বায়না ধরলো জয়কাকুদের বাড়ি চণ্ডীপাঠ ও শান্তিযজ্ঞ দেখতে যাবে। জয়কাকু পিংকির বাবার মাসতুতো ভাই। থাকেন মুর এভিনিউতে। ওঁদের বাড়িতে দুর্গোপুজোর এই কয় দিন চণ্ডীপাঠ ও শান্তিযজ্ঞ হবে। জয়কাকুর মা ও বাবা অর্থাৎ ভালদাদু ও ফুলদিদা কাশীর অঘোরবাবার শিষ্য-শিষ্যা। ভালদাদু ও ফুলদিদাকে অঘোরবাবা খুব ভাল-বাসেন। দিনকয়েক হলো কাশীর আশ্রম ছেড়ে তিনজন শিষ্যসহ জয়কাকুদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। তিনি নিজেই যজ্ঞ করবেন. শান্তিযজ্ঞ। চণ্ডীপাঠ করবেন ভালদাদুরই পরিচিত হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

হরিপ্রসাদ পেশায় অধ্যাপক। কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা পড়ান।

গত সপ্তাহে ভালদাদু ও ফুলদিদা নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন লাল রঙের কনটেসা গাড়ি করে। পিংকির লাল রঙের গাড়ি খুব পছন্দ। যদিও নিজেদের গাড়ির বর্তমান রঙ নেহাতই সাদা, যাকে বলে সাদা-মাটা একটা ফিয়াট।

ভালদাদু ভারী মজার মানুষ। মজার মজার কথা বলেন। চার্লি চ্যাপলিনকে নকল করতে পারেন। ইচ্ছেমত কান নাচাতে পারেন। নাক টিপে মুখ দিয়ে গীটার ও সানাইয়ের সুর বাজাতে পারেন।

ভালদাদু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বছর আটেক হল নিজেই একটা কোম্পানী করেছেন। বয়স, বছর পঞ্চান্ন। পেটান স্বাস্থ্য। তামাটে রঙ। দারুণ খাটতে পারেন। এমন মজার মানুষটা কী করে কোম্পানী চালান? ভালদাদুকে দেখলেই পিংকির এই প্রশ্নটাই মনে আসে।

ফুলদিদা এককালে যে দুর্গা প্রতিমার মত দেখতে ছিলেন, তা এখন এই আটচল্লিশ বছর বয়েসের চেহারা দেখলেও বোঝা যায়। এখনও স্বর্ণচাপার মত গায়ের রঙ। বড় বড় টানাটানা চোখ। ফুলদিদার কাছে দাঁড়ালেই পিংকি সুন্দর একটা ফুলের গন্ধ পায়। পিংকির মনে হয় এটা দিদার সেন্টের নয়, দিদার শরীরেরই গন্ধ।

পিংকি শুনেছে, এককালে ফুলদিদার খুব গান ও গয়নার শখ ছিল। এখন যে দুটি নিয়ে মেতে আছেন তা হল, নারী-মুক্তি আন্দোলনের কাজে দৌড়ো-দৌড়ি করা, ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধ্যানে বসা। 'বঙ্গীয় নারী কল্যাণ সমিতি'র সভাপতি এবং অঘোরবাবার শিষ্যা হয়ে বড় সময়ের অভাবে ভুগছেন।

ওঁদের দুই ছেলে। জয় আর বিজয়। জয়কাকু খড়্গপুরের আই. আই. টি-তে পড়ছে। বিজয় পড়ছে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে। দুজনেই বাবার মত স্বাস্থ্য ও আমুদে স্বভাব পেয়েছে।

ভালদাদু ও ফুলদিদা বাড়িতে আসা মানেই একটা জম-জমাট মজার ব্যাপার। পড়ার পাঠ বন্ধ। শুধু মজা দেখ, মজা কর, মজা শোন। ভালদাদু বড়দের মতই ছোটদের সঙ্গে এত জমে যান যে তখন মনে মানুষটা বোধহয় পিংকিদেরই বয়সী।

পিংকির দফায় দফায় অনুরোধে বার কুড়ি কান নাচালেন। নাক টিপে সানাই বাজালেন। চার্লি'র মতন করে হাঁটলেন। শুকনো মেঝেতে পায়ে পা জড়িয়ে অদ্ভুত কায়দায় কয়েকবার আছাড় খেলেন।

ভালদাদুর কান্ড দেখে পিংকির সঙ্গে সঙ্গে ওর মা, বাবা ফুলদিদা হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন।

পিংকির আঁকা 'চিত্রে-কাহিনী'র ছবি ও লেখা পড়তে পড়তে দু টাকা সাইজের রাজভোগের মতন চোখ করে ভালদাদু বললেন, 'দারুণ এঁকেছিস তো? কাহিনী কার?"

"—আমারই"।

পিংকির জবাব শুনে "হু-রে-রে" বলে এক বিশাল চিৎকার করে পিংকির পিঠে বিশাল থাপ্পড় মেরে বললেন, "বাপকে ছাড়াবি দেখছি।"

পিংকির ম্যাজিক দেখলেন, তারিফ করলেন হা-লুম করে পিংকির গালে একটা বিশাল চুমু খেয়ে।

হৈ-চৈ করে "একটা ঘণ্টা জমিয়ে রেখে বিদায় নেবার সময় পিংকির বাবাকে বললেন, বুঝলে আনন্দ, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষ আজও এই সমাজেই আছে। কিন্তু তারা কি আর তোমার চ্যালেঞ্জের তোয়াক্কা করেন? তুমি যা করছ নিশ্চয়ই সেটা খুবই ভাল কাজ।

সমাজে বুজরুক, নকল সাধুদের মুখোস খুলে দিচ্ছ। জোচ্চোর আর ভণ্ডদের ভাণ্ডা ফোর করছ, এটা সর্বশ্রেণীর মানুষই সমর্থন করবে। কিন্তু তুমি যদি মনে করে বসে থাক, অলৌকিক বলে কিছু নেই। কারও অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে না; তবে কিন্তু বেজায় ভুল করবে।"

"তুমি তো নিজেকে একজন যুক্তিবাদী ও সত্যানুসন্ধানী মনে কর। একটি অনুরোধ, আমার বাড়িতে এসে অঘোরবাবাকে দেখ, তাঁর বিষয়ে সত্যানুসন্ধান কর। আশা রাখি, তুমি যদি অঘোরবাবার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাও তবে একজন সৎ মানুষ হিসেবে, যুক্তিবাদী হিসেবে তাঁর সেই ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেবে।"

"তা-ছাড়া, এসোই না একবার। নতুন অভিজ্ঞতা হবে, নতুন লেখার খোরাক পাবে।"

আনন্দবাবু অর্থাৎ আনন্দ ঘোষ পিংকির বাবা। নেহাতই ভাল-মানুষ গোছের লোক। হৈ-হৈ করে আনন্দ ফুর্তিতে থাকতে ভাল-বাসেন। আর ভালবাসেন গুচ্ছের বই পড়তে বিশেষ করে মনো-বিজ্ঞানের বই। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। শ্যামলা রঙ। ছিপছিপে চেহারা। উচ্চতায় পাঁচ সাড়ে-সাত। পেশায় ব্যাংক কর্মী হলেও নেশা লেখা। এর বাইরে আর একটি নেশা আছে—সত্যানুসন্ধান। পত্র-পত্রিকায় কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা পড়লে বা কারও মুখে কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলে আসল রহস্য খুঁজে বের করতে অনুসন্ধানে নেমে পড়েন। ম্যাজিক জানেন।

ঘরের দেওয়ালগুলো বইয়ের-র‍্যাকেই ঢাকা পড়ে আছে। সেখানে দেশি-বিদেশী এমন কি দুষ্প্রাপ্য অনেক ম্যাজিকের বই রয়েছে।

আনন্দবাবু সম্মোহন করতে জানেন। জাদুকরের মত সাজান নকল সম্মোহন নয়, মনোরোগ চিকিৎসকদের মত আসল সম্মোহন। মস্তিষ্ক কোষ, সম্মোহন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতাও দেন মাঝে-মধ্যে।

পিংকির মা প্রীতি পিতৃকুল থেকে তিনটি জিনিস পেয়েছেন, সৌন্দর্য, গান ও রাগ। ভালবাসেন পরিপাটি করে সাজতে ও নানা রকম নতুন নতুন খাবার রাঁধতে। বয়েস কবেই তিরিশ পেরিয়েছে, কিন্তু যোগ

ব্যায়ামের কল্যাণে দেখায় অনেক কম। প্রতিদিন পাকা এক ঘণ্টা ধরে ব্যায়াম, দেড়-ঘণ্টা গলা সাধা, আধঘণ্টা পুজো, এসব নিত্যকার রুটিন। চাকরি না করলেও যথেষ্ট ব্যস্ত মহিলা। 'সুর-সঙ্গম'-এ গান শেখান। বাড়িতেও মেলা ছাত্র-ছাত্রী। জলসা-রেডিও-টেলিভিশন-এ গানের পাশাপাশি মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের রূপচর্চা, সাজ-সজ্জা, রান্না-বান্না বিষয়ে কলম চালান। মাসের মধ্যে অন্তত তিন-চারদিন রেগে ওঠেন তা সে যা নিয়েই হোক। আনন্দবাবু বলেন, "ওটা হাই-প্রেসারের অ্যাকশন। প্রেসার-কুকার থেকে বাড়তি প্রেসার বেরিয়ে যাওয়ার মতই বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে বার্স্ট করার ভয় থাকবে না।"

পিংকি ওরফে পিনাকী আনন্দবাবু ও প্রীতিদেবীর একমাত্র ছেলে ও সন্তান। পিংকি মায়ের মতই লম্বা হওয়ার ধাত পেয়েছে। বয়েস ন'বছর হলেও মাথাটা এরই মধ্যে পাঁচ-ফুট ছুঁই-ছুঁই করছে। পড়ে দমদম সেণ্ট মেরিজ স্কুলে ক্লাস থ্রিতে। লেখা-পড়া ছাড়া আর সব কিছুতেই অতি উৎসাহী। ওর মাথায় দুটি জিনিস ভাল খেলে, গল্পের প্লট ও দুষ্টু বুদ্ধি। বর্তমানে ম্যাজিকের উপর উৎসাহটা খুবই চাগিয়ে উঠেছে। বাড়িতে রবিবার সকালের আড্ডায় মাঝে মাঝে কয়েকজন ম্যাজিসিয়ানও আসেন। এঁদের মধ্যে জ্যোতি জ্যেঠু, আশিসকাকু, তন্ময় কাকুকে পিংকি দস্তুর মত বন্ধু করে নিয়েছে। এঁদের কাছ থেকে ম্যাজিক শিখছে, ম্যাজিকের টুক-টাক জিনিস-পত্তর উপহার পাচ্ছে।

পিংকির গত জন্মদিনে আর এক ম্যাজিককাকু পি. সি. সরকার জুনিয়র তিনটে ম্যাজিকের বই উপহার দিয়েছেন। বই তিনটে এখন পিংকির সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই টুকটাক ম্যাজিক দেখিয়ে অবাক করে দিচ্ছে। অবশ্য, মাঝে-মধ্যে যে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে না তা নয়। কাপড়ে আগুন লাগালেও পুড়বে না—ম্যাজিকটা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে মায়ের তিনটে শাড়িতে ঘুঁটের সাইজের ফুটো করে ফেলেছে। দিন পনের আগে একটা কেমিকেল ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা পুড়িয়েছে।

অঘোরবাবার কাছ থেকে অদ্ভুত একটা কিছু দেখার প্রত্যাশায় পিংকি তাই সকাল থেকেই বায়না ধরেছে জয়কাকুদের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।

একমাত্র ছেলের বায়না বলে কথা। আনন্দবাবুকে ও প্রীতিকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। অবশ্যই সঙ্গী হল পিংকি। গিয়ে বেশ ভালই লাগল। বিভিন্ন আত্মীয়র সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হল। একটা হৈ-হৈ-রৈ রৈ ব্যাপার। নানা বয়সের মানুষ জনের ভীড়ে, স্পিকারে ছড়িয়ে পড়া চন্ডী পাঠের সুরে কেমন একটা পুজো পুজো গন্ধ।

লনে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। একপাশে সুন্দর ছিমছাম সাজানগুছোন বেদীর মতো স্টেজ। সেখানে কয়েকটা মিউজিক হ্যান্ড নিয়ে চন্ডীপাঠ করছেন হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য। টকটকে ফর্সা। শরীরে সামান্য মেদ জমেছে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে কাঁচা-পাকা এক মাথা চুল। পরিধানে ধবধবে সাদা ফিনফিনে ধুতি। খালি গা। গলায় ঝুলছে একগাদা ফুলের মালা। হরিপ্রসাদের চন্ডীপাঠের মধ্যে রয়েছে নাটকীয়তা।

ম্যারাপের নীচে মখমলের মত ঘাসের উপর সারি সারি দুধ সাদা লোহার ফ্রেমে নাইলনে বোনা চেয়ার। রঙ-বেরঙের মেয়ে-পুরুষ চেয়ারে বসে চন্ডীপাঠ শুনছেন। যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি লনে এসে বসেছে।

চন্ডীপাঠ শেষ হতেই শ্রোতারা উসখুস করতে লাগলেন। মাইকে সুন্দর কণ্ঠে ঘোষিত হল, "এবার মহাসপ্তমীর মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবেন যুগাবতার পরম পুরুষ শ্রীশ্রী অঘোরবাবা।"

ম্যারাপের মাঝখানে ইট-সিমেন্ট বালি দিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে একটা বড়সড় বেদী। বেদীর মাঝখানে যজ্ঞকুন্ড। বেদীতে ওঠার জন্যই চারপাশেই রয়েছে সিঁড়ির ধাপ। বেদীটা অন্তত সাড়ে চার ফুট উঁচু। আমন্ত্রিতদের যাতে যজ্ঞ দেখতে অসুবিধে না হয়, তাই এই ব্যবস্থা।

যজ্ঞের আসল নায়ক অঘোরবাবা যখন যজ্ঞবেদীর কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন দর্শকদের সমস্ত গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। লম্বায় কম করে ছ ফুট। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা। বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। সঠিক অনুমান করা যথেষ্ট

কঠিন। পরনে রক্তবর্ণের সিল্কের কাপড় ও উত্তরীয়, গলায় রুদ্রাক্ষের তিনটে ও বহুবর্ণ পাথরের একটা মালা। দু'হাতের আঙুলে গোটা ছয়েক গ্রহরত্নের আংটি। ডান বাহুতে সোনার চেনে বন্দী হয়ে রয়েছে একগাদা গ্রহরত্ন। কপালে গোলা সিঁদুরের টিপ। পায়ে চন্দন কাঠের খড়ম।

অঘোরবাবাকে ঘিরে ভক্তদের ভীড়। বয়স্কদের ভীড়ে একটি মাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ককে দেখা গেল। সে আর কেউ নয়, পিংকি। একেবারে অঘোরবাবার গা ঘেঁসে রয়েছে। ওকে ওখানে দেখে আনন্দবাবু যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। কী যে একটা ছেলে হয়েছে? কোথায় ওর বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলবে, তা নয়; বুড়োদের মত এখানে এসে জুটেছে।

পিংকির অঘোরবাবাকে বেশ পছন্দ হয়েছে। অঘোরবাবা একটু আগে তাঁর বিশ্রাম কক্ষে পিংকির সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনটে বড় সাইজের জলভরা তাল শাঁস সন্দেশ খাইয়েছেন।

পিংকিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার বাবা কী করেন?"

পিংকির চট্‌পট্‌ জবাব, "লেখক। ব্যাঙ্কেও কাজ করেন।"

"কোথায় লেখেন?"

"এখনকার অনেক পত্র-পত্রিকাতেই লেখেন, এ ছাড়াও বইও আছে।

অঘোরবাবা বললেন, ' বাঃ, খুব ভালো। তোমার মা কী করেন?"

"চাকরী করেন না। তবে রেডিওতে ও টেলিভিশনে গান করেন আর ফ্যাসান নিয়ে পত্রিকায় লেখেন?"

"তুমি বড় হয়ে কী হবে?"

"আগে ভাবতুম শুধু বৈজ্ঞানিক আর লেখক হবো। এখন ভাবছি, সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবো।"

অঘোরবাবা পিংকির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "হবে, তোমার হবে। অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়। বিজ্ঞানের লৌকিক নিয়ম না মেনে যা হয় তাই অলৌকিক।"

"তোমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে?" পিংকির চোখে বিস্ময়।

"অঘোরবাবা মৃদু হাসলেন। "অপেক্ষা কর, যজ্ঞের সময় দেখতে পাবে।'

যজ্ঞ বেদীতে বাঘছালের বিরাট আসনে এসে বসলেন অঘোরবাবা। সামনে যজ্ঞকুণ্ড সাজান রয়েছে। যজ্ঞকুণ্ডের একপাশে পাট কাঠি ও বেল কাঠ, ঘিয়ের টিন ও বিশাল তামার পাত্রে স্তূপাকার বেলপাতা। অঘোরবাবার ঠিক সামনের একটা তামার কানা উঁচু বাটি।

অঘোরবাবা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হুংকার ছাড়লেন, "মা, মা—গো –"

অমনি উপস্থিত ভক্ত দর্শকেরা চিৎকার করে উঠলেন, "জয় অঘোরবাবার জয়। জয় অঘোরবাবার জয়। জয় অঘোরবাবার জয়।"

অঘোরবাবা এবার তামার বাটির ওপর হাতের আঙুলগুলো নানা ভঙ্গিমায় নাড়তে লাগলেন, যেন আরতি করছেন। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই হুংকার ছাড়তে লাগলেন— "মা, মা—গো—"

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে শূন্য তামার বাটিতে ধপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

বিস্ময়ে হতবাক্ ভক্তরা উন্মাদের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। অঘোরবাবার জয়ধ্বনিতে ম্যারাপের চাঁদোয়া ও তেরপল ফেটে যাবার যোগাড়। সেই জয়ধ্বনির মধ্যেই অঘোরবাবা অলৌকিক আগুন দিয়ে যজ্ঞের পাট কাঠি জ্বালালেন। মেরাপের তলায় তখন দারুণ উত্তেজক অবস্থা। পাট কাঠির আগুন থেকে জ্বলে উঠল যজ্ঞকুণ্ড।

"দেখলে বাবার অলৌকিকত্ব?"

আনন্দবাবুর কানের কাছে কে যেন কথাটা বললেন। আনন্দবাবু মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন ভালমেসোকে অর্থাৎ, পিংকির ভাল-দাদুকে। ভালদাদুর দু'চোখ আনন্দে চক্‌চক্ করছে। সারা মুখে একটা অদ্ভুত খুশী খুশী ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

আনন্দবাবু কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে পিংকির আঙুলের খোঁচা খেয়ে ওর দিকে তাকালেন।

বাবাকে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়ে গেল পিংকি।

কালকের তুলনায় আজ দুপুরের ভীড়টা বেশি। মুখে অঘোর-বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা যে একদিনই অনেক দূর ছড়িয়েছে, তা ভীড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না।

পিংকি আজও অঘোরবাবার কাছ থেকে কড়া-পাক সন্দেশ পেয়েছে। বিনিময়ে অঘোরবাবাকে 'গুপিগাইন বাঘাবাইন' সিনেমার দুটো গান শুনিয়েছে। অঘোরবাবা গানের খুব তারিফ করে বলেছেন, "সাবাশ ব্যাটা. দারুণ গেয়েছিস।"

পিংকি অঘোরবাবার কাছে বায়না ধরল, "আমি আজ তোমার পাশে যজ্ঞবেদীতে বসবো।'

অঘোরবাবা হেসে বললেন, "বেশ তো বসিস। তোর বাবা কাল আমার সম্বন্ধে কী বললেন?"

"বাবা একেবারে অবাক।"

"অথচ আসলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তাঁর কৃপা পেলে সব অসম্ভবই ঘটানো সম্ভব।" অঘোরবাবার চোখ আবেগে বুজে এলো। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানালেন।

আজ যজ্ঞবেদীতে বাঘছালের আসনের পাশে একটা কার্পেটের আসন পাতা হয়েছে অঘোরবাবার নির্দেশে। পিংকি বসবে।

বেলা ঠিক বারোটার সময় অঘোরবাবা ভক্তদের দর্শন দিতে লনে এসে দাঁড়ালেন। কালকের মত একই পোশাক। সঙ্গে আজ পিংকি। ওর পরণেও টুকটুকে লাল সিল্কের কাপড় দু ভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরা। গায়ে লাল সিল্কের পাঞ্জাবি। অঘোরবাবার কথায় কাল রাতের মধ্যেই পিংকির জন্য এই পোশাকের ব্যবস্থা করেছেন ভালদাদু। অঘোরবাবার দর্শন পেয়ে ভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। সকলেই চান অঘোরবাবার পায়ের ধুলো নিতে।

আজ যে ভক্ত সমাগম বেশি হবে সেটা অনুমান করে তাঁদের সামলাতে কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ভালদাদু ও ফুলদিদা। স্বেচ্ছাসেবকরা পাড়ার ছেলে বা ভালদাদুর কোম্পানীর কর্মচারী। স্বেচ্ছাসেবিকারা এ পাড়ারই মেয়ে বা নারী কল্যাণ সমিতির সভ্যা। অতি উৎসাহি ভক্তদের এঁরাই সামলাচ্ছিলেন।

মাত্র পাঁচ মিনিট ভক্তদের প্রণাম নিয়ে অঘোরবাবা ভক্তদের প্রচণ্ড জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে পিংকির হাত ধরে এগুলেন যজ্ঞবেদীর দিকে।

এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে প্রীতির দু'চোখ বেয়ে জল নেমে এলো। গোটা মুখ জুড়ে সনাতন বঙ্গ-ললনার কোমলতা ও ভক্তি বিরাজ করছে।

যজ্ঞবেদীতে উঠে আসন গ্রহণ করলেন অঘোরবাবা। পিংকিকে বসতে ইশারা করতে পিংকিও বসল পদ্মাসনে। অনবরত ফটো-গ্রাফারদের ফ্ল্যাসের আলোয় পিংকির চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কতজন ফটোগ্রাফার হবে? পিংকি গোণার চেষ্টা করল। ও'রা এত দ্রুত জায়গা পরিবর্তন করে ছবি তুলছেন যে গোণা মুশকিল। আন্দাজে মনে হল পনের জনের কম নয়। ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছেন গোপাল দেবনাথ। গোপাল বিভিন্ন পত্রিকার হয়ে ছবি তোলেন। পিংকির বাবার পরিচিত, পিংকিরও পরিচিত।

মুহূর্তের জন্য ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে পিংকির দিকে তাকিয়ে হাসলেন গোপাল। পিংকিও হাসল। ভীড়ের মধ্যে মাকে খোঁজার চেষ্টা করল। হঠাৎই মায়ের সঙ্গে চোখাচুখি হল। লালপেড়ে গরদের শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন মা। মা কী কাঁদছিলেন? আজ মা'র পরণে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। কপালে টুকটুকে লাল সিঁদুরের টিপ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মা কে আদর করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। মায়ের পাশেই মিঠু পিসি, কোলে পিসতুতো বোন টুয়া, টুয়া ক্লাস টুতে পড়ে। ছোট তো তাই মায়ের কোলে চেপেছে পিংকিদা ও অঘোরবাবাকে দেখতে।

জয়কাকু ও বিজয়কাকুকে দেখতে পেল পিংকি। ওরা দু'জনেই চওড়া পাড়ের ধুতি ও ঘিয়ে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে।

যজ্ঞবেদীর কাছাকাছি অঘোরবাবার তিনজন সঙ্গী-শিষ্য ছাড়া কয়েকটি চেনা মুখও চোখে পড়ল। জ্ঞান মল্লিক, সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, প্রবাল বাগচী, সৌগত রায় বর্মন ও সুব্রত জানা, এ'রা প্রত্যেকেই বাবার খুব ঘনিষ্ঠ এবং বাবার সত্যানুসন্ধানী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। পিংকির চমক ভাঙল অঘোরবাবার "মা, মা'গো" —চিৎকারে।

অঘোরবাবার সামনে একইভাবে বেলকাঠ সাজিয়ে যজ্ঞকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। পাশে বেলপাতা, ঘি বেলকাঠ ও পাট কাঠি। সামনে, হাতের নাগালে তামার বড় একটা বাটি। এমনি একটা বাটিতেই

কাল অগ্নি দেবতাকে আহ্বান করে নিয়ে এসেছিলেন অঘোরবাবা।

অঘোরবাবা সবে ডানহাত তুলেছেন আরতির ভঙ্গিতে, অগ্নি-দেবতাকে আহ্বান জানাবেন বলে, এমনি সময় একটা অঘটন ঘটে গেল। পদ্মাসনে স্থির পিনাকী হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠে তামার বাটিটা ডান হাতে টেনে নিল। একই সঙ্গে পোশাকের আড়াল থেকে বাঁ হাতে বের করে আনল আর একটা তামার বাটি। বাঁ হাতের বাটিটা অঘোর-বাবার সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল, "আজ এই বাটিতে আগুন জ্বালো।"

বিস্মিত অঘোরবাবা বললেন, "এ কী হচ্ছে?"

বিস্ময়ের ছোঁয়া লেগেছে উপস্থিত দর্শকদের চোখেও।

অঘোরবাবার ফরসা মুখে কে যেন আলতা ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রাণ-পণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে চাপা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "এটা চ্যাংড়ামো করার জায়গা নয়। বাটিটা রেখে দিয়ে তলায় চলে যাও।"

পিংকি নির্বিকার কণ্ঠে বললো, "উঁহু এখন দিচ্ছ না। আগে আমার বাটিতে অগ্নিদেবকে আহ্বান করে আন, তারপর দেব।"

কিছুক্ষণ আগের বিরাট ব্যক্তিত্ব অঘোরবাবাকে কেমন অসহায় মনে হল। তিনি হাত বাড়িয়ে পিংকির সরিয়ে ফেলা বাটিটা ধরতে গেলেন।

পিংকি একটু সরে গিয়ে বলল. "তুমি সত্যিই অলৌকিক উপায়ে আগুন জ্বাললে অন্য বাটিতে জ্বালতে অসুবিধে কোথায়? নাকি তোমার বাটিতেই কিছু কৌশল করে রেখেছ যাতে হাত নাড়লে আগুন জ্বলে ওঠে?"

অঘোরবাবার তিন সঙ্গী-শিষ্য দ্রুত যজ্ঞবেদীতে উঠতে গেলেন। উদ্দেশ্য বাচ্চা ছেলের বাচালতা বন্ধ করা। অমনি যেন রাগবী খেলা শুরু হয়ে গেল। হুড়োহুড়ি, জড়াজড়ি, সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। এক পলক সেদিকে তাকিয়ে নিতেই পিংকির বুঝতে অসুবিধা হলো না, পিংকির সত্যানুসন্ধানী কাকুরা খেলায় নেমে পড়েছেন।

ভালোমানুষ ভালদাদু গুরুদেবের এ-হেন হেনস্থায় যে প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছেন তা তাঁর তারস্বর চিৎকারে বোঝা যাচ্ছিল।

পিংকির পাগলামো দেখে রাগে দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন প্রীতি।

ফুলদিদা দৌড়ে যজ্ঞবেদীর দিকে এগুতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। এ কি সব অলক্ষণে কাণ্ড ঘটছে আজ! কে যেন হাত ধরে তুললেন ফুলদিদাকে। লজ্জায় অপমানে ফুলদিদা কেমন যেন হয়ে গেলেন। ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু গুরুদেব আর পিংকির দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ অমঙ্গল আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠল। পিংকির ছেলেমানুষিতে রেগে গিয়ে ওকে কোনও অভিশাপ দিয়ে বসবেন না তো গুরুদেব? গুরুদেবই বা কী? ছেলেমানুষের কৌতূহলকে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিয়ে ওর দেওয়া বাটিতে আগুন জ্বালালেই তো সবকিছু মিটে যায়।

মেটালেন অবশ্য অঘোরবাবাই। ক্রুদ্ধ অরণ্যদেবের মতো বরফ-ঠাণ্ডা গলায় পিংকিকে বললেন, "বেশ তো, তুমি বা তোমার বাবা আমার বাটিতেই হাত নেড়ে আগুন জ্বালাও। জ্বালতে পারলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে আমি কৌশলের সাহায্যে আগুন জ্বালতাম। প্রমাণ হয়ে যাবে আমি বুজরুক।"

অঘোরবাবা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বিশ্রী ঘটনার উপর যবনিকা টানতে চাইলেন।

অঘোরবাবার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ভক্ত মানুষদের শক্তি যোগাল। হিস্টিরিয়া রোগীর মতই রে-রে করে ক্ষেপে উঠলেন অনেকে। "অঘোরবাবাকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা?" কেউ একজন বাজখাঁই গলায় চেঁচালেন।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে পিংকির কিছু সমর্থকও জুটে গেল। "ঠিকই তো! অলৌকিক ক্ষমতায় আগুন জ্বালাতে পারলে ওই ছেলেটার দেওয়া বাটিতে কেন জ্বালাতে পারছেন না?" এক যুবক এগিয়ে এসে জোরালো প্রশ্ন রাখল।

"আমার বাবাকে আসতে হবে না। আমাকেই একটু চেষ্টা করতে দাও।" অঘোরবাবাকে কথাগুলো বলল পিংকি।

আর এক প্রস্থ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই চরম উত্তেজনা আর থরথর আবেগ নিয়ে যতদূর সম্ভব চোখ বড় বড় করে লক্ষ্য করতে লাগলেন পিংকির প্রতিটি কাজকর্ম।

পিংকি ওর সামনে নামিয়ে রাখল অঘোরবাবার বাটি। অঘোর-বাবার কায়দায় হাতটা নাড়তে লাগল বাটির উপরে।

ফটোগ্রাফারদের ফ্লাসে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে গোপালকাকুর ভিডিও ক্যামেরাটা ওর খুব কাছে এসে পড়েছে।

অবাক কাণ্ড। বাটিতে ধপ্ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

ম্যারাপের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক শ উত্তেজিত দর্শক মুহূর্তে হতবাক্। অঘোরবাবাও কম বিস্মিত হননি।

আনন্দবাবু অঘোরবাবার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "এবার আপনি আগুন জ্বালুন।"

অঘোরবাবা যেমনভাবে ফ্যালফ্যাল করে আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাতে বোঝা গেল ওর এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

আনন্দবাবু এবার যজ্ঞবেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে গলার স্বর যতদূর সম্ভব তুলে সমবেত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এখনি যে ছেলেটি হাত নেড়ে আগুন জ্বালাল, সে আমারই ছেলে পিংকি। ও কোনও অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে এই আগুন জ্বালেনি। অঘোরবাবা যে পদ্ধতিতে আগুন জ্বালেন ও সেই পদ্ধতিতেই আগুন জ্বেলেছে।

"অঘোরবাবার বাটিতে ছিল কিছুটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। আর, আমার ছেলের ডান হাতের তেলোতে আংটির খাঁজে লুকোন রয়েছে একটা গ্লিসারিন ভর্তি প্লাসটিকের ড্রপার। পিংকি হাত নাড়তে নাড়তে আপনাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন বাটিতে ফেলে দিয়েছিল। দুটি পদার্থ সংস্পর্শে এসে কিছুক্ষণের মধ্যে ধপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। সত্যিকার অলৌকিক ক্ষমতায় আগুন জ্বালাবার ক্ষমতা অঘোরবাবার নেই। তাই উনি পারছেন না। আমি আবারও বলছি, উনি পারবেন না। আপনারা ওঁর দু'হাতের তালু পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন আংটির খাঁজে লুকোন রয়েছে গ্লিসারিন ভর্তি ড্রপার।

আনন্দবাবু এবার অঘোরবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবাজী, আপনার হাত দুটো একটু দেখাবেন?"

অঘোরবাবা কিছু একটা বলতে চাইলেন। হয়তো বা প্রতিবাদ করতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। আনন্দবাবুর স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অসহায় মনে হল নিজেকে।

অঘোরবাবার হাবভাব দেখে ভক্তদের তখন ভক্তি চট্‌কে গেছে।

তারা অঘোরবাবাকে এই মারে কি এই মারে।

"লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়" এই কথাটাকে স্মরণ করে অঘোরবাবার ছ'ফুট দেহটা আনন্দবাবুর পায়ের উপর আছড়ে পড়ল। 'আমাকে বাঁচান, দয়া করে পুলিশে দেবেন না। কথা দিচ্ছি, আর এমনটি করব না।"

পিংকি বলল, "না বাবা, তুমি পুলিশেই খবর দাও। ছেড়ে দিলে অন্য জায়গায় গিয়ে লোক ঠকাবে।'

শান্তি যজ্ঞের উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক ভালদাদু এগিয়ে এসে বললেন, "ওকে পুলিশেই দাও আনন্দ। ইস্, ছিঃ ছিঃ। একটা জোচ্চোরকে কিনা আমরা এত দিন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি। আশ্রম চালাবার জন্যে টাকা পাঠিয়েছি!"



নিরালম্ববাবা ও আনন্দবাবু

আজ ৭ জানুয়ারি ১৯৮৪, শনিবার।

এই মুহূর্তে পিংকি ওরফে পিনাকী এতই উত্তেজিত যে ডিসেম্বরের দেওঘরের শীতেও ঘামছে।

গলা থেকে মাফলারটা খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে তাকাল বাবার দিকে। বাবা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নিরালম্ববাবার দিকে।

এবার বাবা বেশ মুশকিলে পড়েছেন! বাবার এতদিনের বিশ্বাসটাই বোধহয় আজ বিপন্ন! বিজ্ঞান অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোনও কিছুর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন না। বাবা একজন বিজ্ঞান-মনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করেন, অলৌকিক বলে কোনও কিছু থাকতে পারে না। প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার পিছনেই রয়েছে লৌকিক বা জাগতিক কারণ।

আজ নিরালম্ববাবার কাছে বাবাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে পিংকি বেশ মজাই পাচেছ, সেই সঙ্গে অদ্ভুত কিছু দেখার উত্তেজনা।

যুক্তি দিয়ে বোঝাও তো যে, এটা অলৌকিক ঘটনা নয়? মায়ের ওপর পিংকির টানটা চিরকালই একটু বেশি। তাই মায়ের ভয়ে সে খুব খুশি।

চাঁদের মতো নরম আলোয় ভেসে যাওয়া হলঘরটার শেষপ্রান্তে নিরালম্ববাবা শূন্যে ভেসে রয়েছেন। ধ্যান করছেন পদ্মাসনে বসে। রোগা পাকানো চেহারা. মাথায় একরাশ জটা, গায়ের রং তামাটে, পরণে লাল টকটকে আলখাল্লা, কপালে একটা লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা। গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের ছড়াছড়ি। যেখানে তিনি ভেসে রয়েছেন, তার ঠিক নীচে মেঝেতে পাতা রয়েছে বাঘছালের আসন।

এই সবে নিরালম্ববাবার ধ্যানঘরের দরজা খুলেছে। ধ্যানঘরে ঢোকার সময় প্রবেশ-দরজার দু'পাশে দু'টো ঝোলানো বোর্ড চোখে পড়েছে। তাতে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা—ঘরে প্রবেশ করার পর মৌন অবলম্বন করুন, আপনার দর্শন শেষ হলে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান ও পরবর্তী ভক্ত-দর্শনার্থীদের দর্শনলাভের সুযোগ দিন।

একটা সুন্দর ধূপের গন্ধ সারা ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা পবিত্র পুজো-পুজো ভাব প্রীতি দেবীর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। পিংকির ইস্কুলের এক্সমাসের ছুটিকে উপলক্ষ করে দেওঘরে বেড়াতে এসে এমন একটা অসাধারণ ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হবে, এমনটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

পিংকির স্কুলে শীতের ছুটি চলছে। এই সুযোগে তিনজনে বেরিয়ে পড়েছে কাছে পিঠে শীতকালের শীতকে উপভোগ করতে।

নিরালম্ববাবার খবরটা দিয়েছিলেন দি গ্রেট দেওঘর হোটেলের ম্যানেজার গোবিন্দ মিত্র। কাল রাতে আনন্দবাবুর খাবার টেবিলের সামনে এসে বিনয়ের সঙ্গে একগাল হেসে বললেন, "কয়েক দিন আছেন তো ?"

আনন্দবাবু মুরগির ঠ্যাঙে কামড় বসাতে বসাতে জবাব দিয়েছিলেন "দাঁড়ান মশাই, আজই তো সবে এলুম। দেখি জায়গাটা কেমন লাগে। ভাল না লাগলে পরশুই গিরিডি চলে যাব।"

"যদি কালকের দিনটাই শুধু থাকেন, তবে বলব, কাল সন্ধের সময় নিরালম্ববাবাকে একবার দর্শন করে আসুন। কলির দেবতা মশাই! সন্ধের সময় ধ্যান করতে করতে মেঝে থেকে অন্তত আড়াই ফুট উঁচুতে উঠে পড়েন।"

"আপনি নিজের চোখে দেখেছেন ?" আনন্দবাবুর চোখে কৌতুক।

"হ্যাঁ মশাই, নিজের চোখে দেখেছি। ছ মাস হল উনি এখানে এসেছেন, তার মধ্যে ছ'বার অন্তত দেখেছি। আর, প্রতিদিনই শয়ে-শয়ে লোক দেখছেন। কত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মিনিস্টার আসছেন। কাল গেলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।"

প্রীতি দেবী তাঁর অতি প্রিয় ইলিশমাছের টুকরোর স্বাদ নিতে ভুলে গিয়ে অবাক চোখে গোবিন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথাগুলো গিলছিলেন। এবার মুখ খুললেন, "এ যুগেও এমন সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া যায় ?"

গোবিন্দ মিত্র অতি বিনয়ে কিছুটা ঝুঁকে একগাল হেসে বলেছিলেন, "পাওয়া যাবে না কেন, এ যুগেও অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন

বই কী। তবে নকলের ভিড়ে আসল খুঁজে পাওয়া মুশকিল।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে পিংকিরও খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল। "চলো না বাবা, কাল সন্ধেবেলা আমরা নিরালম্ববাবাকে দেখে আসি।"

আনন্দবাবু বললেন, "বেশ তো, তাই হবে।" তারপর গোবিন্দবাবুকে বললেন, "তাহলে কাল সন্ধেয় আমরা নিরালম্ববাবাকে দর্শন করতে যাচ্ছি। কাইন্ডলি রিকশা বা টাঙ্গা ঠিক করে রাখবেন।"

রাতে বাবার পাশে শুয়ে পিংকি জিজ্ঞেস করল, "নিরালম্ববাবা শূন্যে ভেসে থাকেন কী করে?"

প্রীতিদেবী ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। পিংকির কথায় ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, তোর বাবা তো সবজান্তা, তাই শূন্যে ভাসার টেকনিকটাও ওঁর জানা।"

স্ত্রীর কথায় আনন্দবাবু হাসলেন, কোনো জবাব দিলেন না। পিংকিকে বললেন, "ম্যাজিক শো'তে স্টেজ থেকে মোটর অদৃশ্য করে হাতি নিয়ে আসার খেলা তো দেখেছিস, অথবা শূন্যে চেয়ার-টেবিল বা মানুষকে ভাসিয়ে রাখার খেলা? এই সবই যে-পদ্ধতিতে সাধারণত দেখানো হয় তাকে বলে ব্ল্যাক-আর্ট।"

"তুমি ব্ল্যাক-আর্ট জানো? আমাকেও ভাসিয়ে রাখতে পারবে?" পিংকি উত্তেজনায় টগবগ করে ওঠে।

"ওসব মোটেই কঠিন নয়। শিখিয়ে দিলে দেখবি কত সোজা।"

"আমার জন্মদিনে বন্ধুদের একটা ব্ল্যাক-আর্টের খেলা দেখাবে? দারুণ মজা হবে।"

"বেশ তো, তাই হবে। তোকেই শূন্যে ভাসিয়ে রাখব।"

"বাবা, আমাকে ব্ল্যাক-আর্টের খেলাটা শেখাবে?"

আনন্দবাবু পিংকির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে শুরু করলেন, "ব্ল্যাক-আর্ট আবিষ্কার করেছিলেন ম্যাক্স আউজিঙ্গার নামের এক জার্মান ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন থিয়েটারের পরিচালক। একবার তিনি একটা নতুন নাটক স্টেজে নামিয়েছেন। সেদিন ছিল অভিনয়ের প্রথম রজনী। নাটকে একটা দৃশ্য ছিল, বাবা তাঁর অবাধ্য মেয়েকে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখবেন, এবং একটি নিগ্রো ক্রীতদাস

সেখান থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবে।

"দৃশ্যটিকে ভয়ংকর করে তুলবার জন্য পরিচালক ম্যাক্স সেই বন্দিনী নায়িকার চারপাশের দেওয়াল কালো পর্দায় ঢেকে দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে ওপরের ছোট্ট একটা জানলা দিয়ে নেমে এল কুচকুচে কালো সেই নিগ্রো ক্রীতদাস।

"নায়িকার এমন নাটকীয় মুক্তিক্ষণে দর্শকদের উত্তেজনায় ও হাততালিতে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু কই, দর্শকদের মধ্যে ঘটনার প্রতিফলন তো নেই! কেন এমনটা হল, বুঝতে ম্যাক্স দ্রুত নেমে এলেন দর্শকদের কাছে। মঞ্চের দিকে তাকাতেই কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। মঞ্চের স্বল্প আলোয় কালো নিগ্রো ক্রীতদাস কালো মখমলের পর্দার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ওকে দেখাই যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাক্স বুঝতে পারলেন যে, কম আলোয় গাঢ় রঙের পর্দা টাঙিয়ে সেই ধরনের গাঢ় রঙের যে-কোনো জিনিস পর্দার সামনে রাখলে জিনিসটা দর্শকদের চোখে পড়বে না, অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

নিরালম্ববাবার শূন্যে ভেসে থাকাটা যে ব্ল্যাক-আর্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাঁর কারচুপিটা কাল যখন কয়েক শো ভক্তের চোখের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে, তখন তাঁর অবস্থাটা কেমন হবে ভাবতেই পিংকি আনন্দে বিছানাতেই বার কয়েক লাফিয়ে নিল। তারপর একটু ভয়-ভয় গলায় বলল, "নিরালম্ববাবার দলবল তোমাকে আবার মারধোর করবে না তো?"

বাবার বদলে মা'ই উত্তর দিলেন। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলে মারধোর খাওয়াই উচিত। যত্ত সব! আগের থেকেই উনি ধরে বসে রইলেন নিরালম্ববাবা ধাপ্পাবাজ।"

আনন্দবাবু গলা নামিয়ে বলবেন, "পিংকি, ঘরের তাপ বাড়ছে। আর নয়, তুই এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

উত্তাপ যে বাড়ছে সেটা বুঝে নিয়ে চুপচাপ চোখ বুজল পিংকি।

আজকে এই মুহূর্তে নিরালম্ববাবাকে দেখে পিংকির বুঝতে অসুবিধে হল না যে, তাঁর এই শূন্যে ভেসে থাকার পিছনে ব্ল্যাক-আর্টের কোনো খেলা নেই। তাঁর ফুটখানেক পিছনেই রয়েছে নেহাৎ

একটা সাধারণ সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে. ফুট-ছয়েক তফাত থেকে দেখলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর মতো কোনো রঙের খেলা এর মধ্যে নেই। তবে?

এই তবেটার উত্তর খুঁজছিলেন আনন্দবাবুও। নিরালম্ববাবার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে সব যুক্তিই কি হেরে যাবে? এও তো দেখেছেন যে, ডঃ প্রদীপ সেনের মতো ঘোর নাস্তিক, বিজ্ঞানের অধ্যাপকও ডমরুবাবার অলৌকিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিতে সাধুবাবার কাজের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে. শেষপর্যন্ত তাঁরই সবচেয়ে বড় ভক্ত ও প্রচারক হয়ে উঠেছেন। নিজের বেলাতেও এমনটাই ঘটবে না তো?

আনন্দবাবুর কপালের দু'পাশটা টিপ্‌টিপ্‌ করতে শুরু করল। আর কী কী কৌশলে ভেসে থাকা সম্ভব? দু'হাতে কপালের দু'পাশটা টিপে ধরে ভাবতে থাকেন আনন্দবাবু। প্রীতি দেবীর সেদিকে নজর নেই। নজর শুধু নিরালম্ববাবার দিকে। তাঁর মনে হল, এমন মহাপুরুষের সামনে নীরবে কয়েক মুহূর্ত কাটানোও যেন মস্ত পুণ্যের কাজ।

সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে আনন্দবাবু হঠাৎই গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে টালমাটাল পায়ে দ্রুত দু-তিন পা এগিয়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন নিরালম্ববাবার গায়ের ওপর। শক্তসমর্থ এক শিষ্য তখনই চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে এল আনন্দবাবুকে ধরে ফেলতে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। আনন্দবাবু হুড়মুড় করে আছড়ে পড়লেন নিরালম্ববাবার গায়ে। নিরালম্ববাবাকে নিয়েই মাটি নিলেন আনন্দবাবু।

নিরালম্ববাবা যেখানে ভেসে ছিলেন, সেখানে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত দৃশ্য বিরাজ করছে। দেওয়াল থেকে ঝোলানো রয়েছে একটা লম্বা ও বাঁকানো লোহার বসার সিট, নিরালম্ববাবার ভেসে থাকার অবলম্বন এতক্ষণ এই লোহার সিটটা বাবাজির শরীরের আড়ালে ছিল অদৃশ্য। বোঝার সুবিধার জন্য উপরে একটা ছবি দেওয়া হল।

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশটা গেল বদলে। পিংকি সবিস্ময়ে দেখল

একটু আগের সেই ভক্তরাই আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নিরালম্ববাবা ও তাঁর চেলাদের দিকে। আর আনন্দবাবুই সেই ক্রুদ্ধ জনতাকে থামাবার চেষ্টা করছেন। পিংকির আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে, বাবার মূর্ছা যাওয়াটা আর কিছুই নয়, অভিনয়। আসলে সত্যানুসন্ধানের জন্যই তিনি অভিনয় করে যাচ্ছিলেন।

সেই রাত্তিরে হোটেলে ফিরে যখন ব্যাপারটা নিয়ে গল্প চলছে, তখন প্রীতি দেবী বললেন, "নিরালম্ববাবা ভণ্ড হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে যেন সবাইকে ভণ্ড ভেবো না। অলৌকিক ক্ষমতাবান লোক আজও আছেন। তেমন মানুষের সন্ধান তুমি পাওনি বলে তাঁদের অস্তিত্ব নেই ভেবো না। দেখছ তো ডমরুবাবার সংস্পর্শে এসে প্রদীপ সেনের মত নাস্তিকও আস্তিক হয়েছে।"

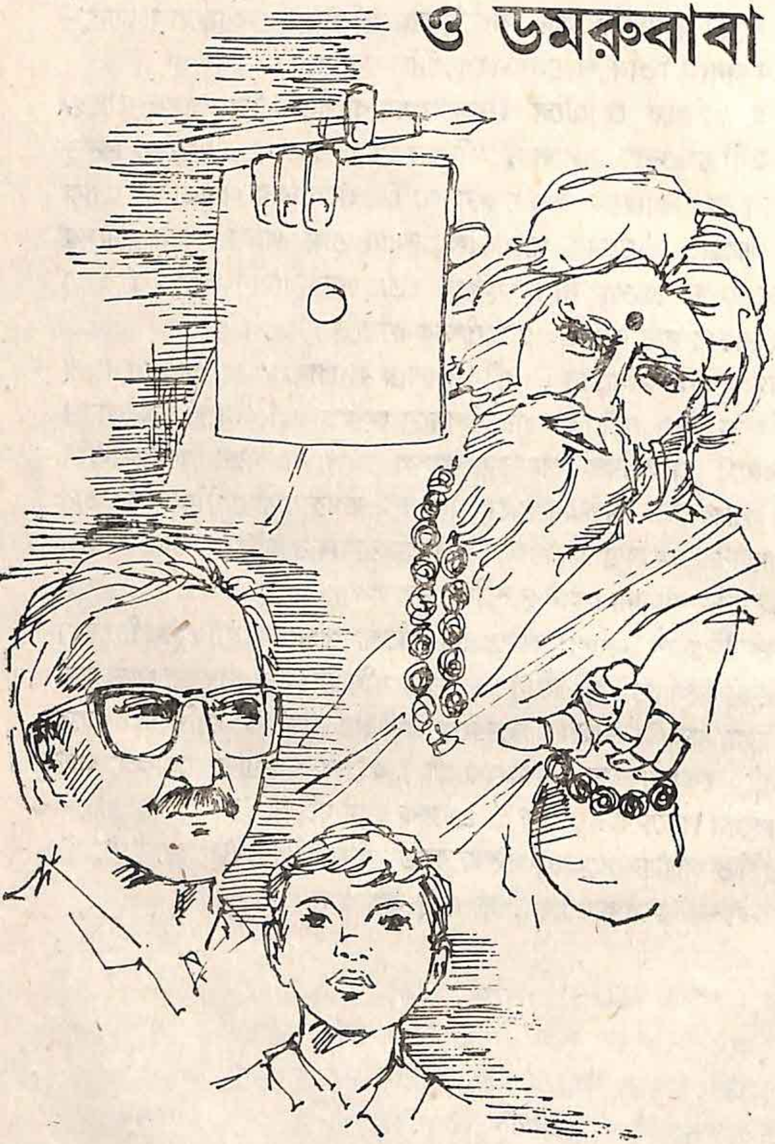
আনন্দবাবু হাসলেন। ধীর গলায় বললেন, "ডঃ প্রদীপ সেনের অলৌকিকে বিশ্বাসী হওয়ার পিছনে রয়েছে তাঁর মিথ্যে অহংকার। ডমরুবাবার অলৌকিক ক্ষমতার আসল রহস্য বা কারণ যেহেতু তিনি ধরতে পারেননি, অতএব ধরে নিলেন ডমরুবাবা লৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। একবারও ভাবলেন না, ডমরুবাবার এই ক্ষমতার পিছনে অবশ্যই তাঁর অজানা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

"ডমরুবাবার মতো অবতাররা তাঁদের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের। তিনি যদি বিজ্ঞান জগতের কেউ হন, তবে তো কথাই নেই। ওদেরকে একবার ভেল্কি দেখিয়ে ঠকাতে পারলেই কেল্লাফতে। অহংকারী এইসব বিখ্যাত লোকগুলোই অবতারদের সবচেয়ে বড় ভক্ত ও প্রচারক হয়ে দাঁড়ায়।"

প্রীতি অ্যাটাচ-বাথে ঢুকতে ঢুকতে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "হুঁ।"

'ধ-ড়া-ম' করে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হল।

মহাযোগী সম্মেলন ও ডমরুবাবা



আজ ৫ আগস্ট '৮৪' রবিবার।

নয়াদিল্লিতে তিন দিন ধরে আন্তর্জাতিক মহাযোগী সম্মেলনের শেষে আজ প্রকাশ্য অধিবেশন। এই তিন দিনের সম্মেলনে এক-এক দেশ থেকে এসেছেন এক-এক ধরনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এঁদের কেউ শুধু হাত নেড়েই আগুনের সৃষ্টি করতে পারেন। কেউ দীর্ঘ দিন প্রাণস্পন্দনকে থামিয়ে দিয়ে সমাধিস্থ থাকতে পারেন। কেউ আবার লিখে যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আজকের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের। অলৌকিক ক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ দিতে উপস্থিত হবেন সম্মেলনের সভাপতি এলাহাবাদের প্রখ্যাত তান্ত্রিক ডমরুবাবা।

অধিবেশন শুরু হতে এখন পনেরো মিনিট বাকি। এরই মধ্যে আইফ্যাক্স হলের প্রতিটি আসন আমন্ত্রিত দর্শকে ভর্তি হয়ে গেছে। দর্শকদের দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এঁরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। আর একটা লক্ষ করার মতন ব্যাপার, দর্শকদের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। ভারতে এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের অনুষ্ঠান এই প্রথম। তাই, প্রতিটি দর্শকই প্রচণ্ড আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সাংবাদিক ও প্রেস-ফোটোগ্রাফারদের বসানো হয়েছে প্রথম দিকের কয়েকটি সারিতে। ওঁদের সারিগুলোকে আলাদা করে বোঝানোর জন্যে একটা বোর্ড টাঙানো হয়েছে ঃ 'PRESS BOX'।

দ্বিতীয় সারির মাঝখানের কোণ থেকে বসেছেন আনন্দ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে পিংকি। পিংকির পাশের আসনে বসেছেন আনন্দবাবুর তরুণ বন্ধু 'সায়েন্স' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ সৌরভ পাল। আনন্দবাবু ব্যাংককর্মী হলেও এসেছেন কলকাতার একটা নামী পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে। স্ত্রী প্রীতিও এসেছেন কলকাতারই এক নামী পাক্ষিক-পত্রিকার তরফ থেকে কাভ্যার করতে। ওদের একমাত্র ছেলে দশ বছরের পিংকিও এসেছে সঙ্গে। বাবার পরিচিত সাংবাদিক বন্ধুদের সহযোগিতায় পিংকিও বাবা-মা'র সঙ্গে প্রেসের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসার সুযোগ পেয়েছে।

আমন্ত্রিত সবাইকেই একটা করে স্মারক-পত্রিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রথম পাতা-জোড়া ছবিটিই হল তন্ত্রসাধক ও সম্মেলনের সভাপতি ডমরুবাবার। পরের দুটো পাতায় ছাপা হয়েছে ডমরুবাবার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্র। তারপরের পাতাগুলোতে রয়েছে বিশ্বের এগারোজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধকের ছবি ও পরিচয়। এঁরা এসেছেন মণ্ট্রিয়ল, শিকাগো, বেলফাস্ট, লিসবন, কায়রো, জাকার্তা, বাগদাদ, তেহেরান, থিম্পু ও কাঠমাণ্ডু থেকে। এ ছাড়াও আর যে দু'জনের ছবিসহ পরিচয় ছাপা হয়েছে, তাঁরা হলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক গোবিন্দ মাকোয়ানা ও প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব শিবকৃষ্ণ আয়ার।

ঘড়ি ধরে ঠিক সন্ধে ছ'টায় মঞ্চের পর্দা উঠল। গোবিন্দ মাকোয়ানা মঞ্চে এলেন। বয়েস পঞ্চাশ ছুঁলেও দেখলে চল্লিশের বেশি কিছুতেই মনে হয় না। হাঁটায় চলায় পোশাকে-আশাকে, কথায়-বার্তায় অতিমাত্রায় স্মার্ট। দেশে শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত হলেও অনেক দেশের বিশেষ কিছু মানুষের কাছে তাঁর খ্যাতি প্যারাসাইকোলজিস্ট হিসেবে। প্যারাসাইকোলজিস্টরা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী। গোবিন্দ মাকোয়ানা তাঁর বিশাল আয়ের কিছুটা এইসব কাজকর্মের পিছনেই ব্যয় করেন। গোবিন্দ মাকোয়ানা অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে শিবকৃষ্ণ আয়ারকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন।

শিবকৃষ্ণ আয়ার মঞ্চে এলেন। ছোটখাট চেহারা। মাঝারি রঙ। বুকের চেয়ে কোমরে মাপ বেশ বেশি।

মালা পরিয়ে প্রধান অতিথিকে বরণ করা হল। আয়ার প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার উদ্বোধন করে ভাষণ শুরু করলেন ইংরিজিতে। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে উনি নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, নতুন করে আজ আবার অলৌকিক শক্তি নিয়ে চর্চা করার সময় এসেছে। বিজ্ঞান যতই এগিয়ে থাকুক, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সীমাহীন অলৌকিক শক্তিকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে জর্জিয়ার এক মহিলা রাশিয়ার প্রাক্তন নায়ক ব্রেজনেভকে দীর্ঘদিন সুস্থ রেখেছিলেন। বোম্বাইয়ের ডাক্তার মহেশ কোনিও অলৌকিক শক্তির সাহায্যে দূর-দূরান্তরের রোগীদের না দেখেই সুস্থ করে তুলছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরি গেলার তো এই তরুণ বয়েসেই কিংবদন্তী পুরুষ হয়ে উঠেছেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতায় স্টিলের চামচের মতন জড় পদার্থকে সম্মোহিত করে বাঁকিয়ে ফেলতে পারেন। বিজ্ঞানের যুক্তির বাইরে এখনও অনেক কিছুই ঘটে চলেছে যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

বক্তৃতা শেষ হতেই প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। তবে সেটা ভাল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে, না বক্তৃতা থামানোর জন্যে, তা বলা মুশকিল।

সবাই এসেছেন অলৌকিক কিছু দেখতে। শুধু বক্তৃতায় কি মন ভরে?

আয়ার খুশী খুশী মনে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতেই এলেন মাকোয়ানা। ইংরিজিতে বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্মারক পত্রিকার পাতায় এগারোটি দেশের এগারোজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। আসুন, এবার এঁদের সঙ্গে আপনাদের চাক্ষুস পরিচয় করিয়ে দিই।

"আমাদের হাতে যা সময় আছে, তাতে এঁদের প্রত্যেকের অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ-জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে কথা দিচ্ছি, আপনাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করব না। আমাদের এই সম্মেলনের সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডমরুবাবা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কিছু প্রমাণ আপনাদের কাছে রাখবেন।

"এখানে একটা কথা স্পষ্টতই বলে রাখি যে, ডমরুবাবা আজ যা দেখাবেন তা নিজের প্রচারের জন্য দেখাবেন না। প্রচার তিনি চান না। তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবেন এটা প্রমাণ করতে যে, বিজ্ঞান যতই অস্বীকার করুক, বাস্তবে অলৌকিত্বের অস্তিত্ব কিন্তু আছে। আমরা প্যারাসাইকোলজিস্টরা এই সত্যটাই যুগ-যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে চলেছি।"

গোবিন্দ মাকোয়ানার আহ্বানে একে-একে হাজির হলেন অলৌকিক

ক্ষমতার অধিকারী এগারোজন। এঁদের প্রত্যেকেরই চেহারায় ও পোশাকে বৈচিত্রের অভাব নেই। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতে কেটে গেল আরও তিরিশটা মিনিট। সবশেষে হাজির হলেন আজকের প্রধান আকর্ষণ তান্ত্রিক ডমরুবাবা। ছিপছিপে চেহারা, টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় বাবরি চুল, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, গলায় তিনটে রুদ্রাক্ষের মালা, বয়েস পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে।

ডমরুবাবা দর্শকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'জন সাংবাদিক ও একজন দর্শককে মঞ্চে আহ্বান জানালেন।

প্রথম সারিতে বসে ছিলেন 'ক্ল্যারিয়ন' পত্রিকার উন্নিকৃষ্ণন ও 'সত্য সমাচার' পত্রিকার রবি তুলপুলে। তাঁরা মঞ্চে উঠলেন। পিছু-পিছু উঠলেন এক মধ্যবয়স্কা সুন্দরী মহিলা। ডমরুবাবার এক শিষ্য ডমরুবাবার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে রাইটিং-প্যাড ও কলম।

ডমরুবাবা হিন্দিতে শুরু করলেন, আপনারা তিনজনে এমন একটা করে প্রশ্ন আমাকে করবেন, যার উত্তর আপনাদের নিজেদের জানা। আমি প্যাডে উত্তর লিখে রাখব। তারপর আপনারা নিজেদের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন ঠিক লিখেছি কি না।"

ডমরুবাবা প্রথমেই মহিলাটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম ?"

"শীলা গুপ্তা।"

"কী করেন ?"

"কিছু নয়। আমি বাড়ির বউ। স্বামী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম-সচিব।"

"আপনার প্রশ্নটা কী ?"

"আমার মা-বাবা দুজনেই কি বেঁচে আছেন ?"

ডমরুবাবা প্যাডে খসখস করে কী যেন লিখলেন। তারপর কলমটা বন্ধ করে শীলা গুপ্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মা বাবা দু'জনেই কি বেঁচে আছেন ?"

"উঁহু, মা বছর দশেক আগেই মারা গেছেন।"

ডমরুবাবা প্যাডের পাতাটা মেলে ধরলেন শীলা গুপ্তার চোখের

সামনে। "কী লেখা রয়েছে জোরে পড়ুন তো।"

"মা মারা গেছেন।"

এবার ডমরুবাবা প্যাডটা মেলে ধরলেন উন্নিকৃষ্ণন ও রবি তুলপুলের চোখের সামনে। "কী ভাই, তাই লেখা রয়েছে তো?"

দুজনেই মাথা নেড়ে জানালেন, তা-ই লেখা রয়েছে বটে।

ডমরুবাবা প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে শিষ্যের হাতে ধরিয়ে দিয়ে উন্নিকৃষ্ণনের দিকে ফিরলেন।

"আপনার নাম?"

"উন্নিকৃষ্ণন।"

"আপনি তো সাংবাদিক। তা কোন্ পত্রিকায় কাজ করেন?"

"ক্ল্যারিয়ন।"

"আপনার প্রশ্নটা কী ভাই?"

"কলকাতার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ মিস্টার মেহেতাকে কে হত্যা করেছে?"

ডমরুবাবা শান্ত গলায় বললেন, "যোগের দ্বারা যে অলৌকিক কিছু ঘটানো সম্ভব, সাধারণ মানুষের কাছে তা তুলে ধরাই আজকের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। কোনও খুনিকে ধরা লক্ষ্য নয়। তাছাড়া খুনির নাম বললেও আপনারা কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, সে-ই খুন করেছে? তার চেয়ে এমন প্রশ্ন করুন, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারেন, সব কিছুই বুজরুকি নয়, অলৌকিক বলেও কিছু আছে।"

"বেশ, বলুন তো আমার কটি সন্তান?" উন্নিকৃষ্ণন তাঁর পঞ্চাশ বছরের স্মার্ট মুখে হাসি ঝুলিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ডমরুবাবা রাইটিং-প্যাডে কিছু হিসেব কষতে লাগলেন। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে লেখা শেষ করে কলম বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কটি সন্তান, মিস্টার?"

"একটিও নয়। বিয়েই করিনি।"

"কিন্তু প্যাডে যে অন্য কিছু লিখে ফেলেছি। দেখুন তো মিস্টার কী লিখেছি?"

প্যাডটা মেলে ধরলেন রবি তুলপুলের চোখের সামনে।

তুলপুলে অবাক গলায় বললেন, "শূন্য লেখা রয়েছে।"

"তাই নাকি? আপনি দেখুন তো মিসেস গুপ্তা।" এবার ডমরুবাবা প্যাডটা এগিয়ে ধরলেন শীলা গুপ্তার সামনে।

"হ্যাঁ, তাই লিখেছেন!" শীলা গুপ্তার গলায় বিস্ময়।

"মিস্টার উন্নিকৃষ্ণন, আপনি নিজেই বরং নিজের উত্তর দেখে নিন।"

উন্নিকৃষ্ণন প্যাডে চোখ বুলিয়ে নিচু হয়ে ডমরুবাবার পায়ের ধুলো নিলেন। মিসেস গুপ্তা এগিয়ে এসে ভক্তিভরে গলায় আঁচল টেনে প্রণাম করলেন। দু'জনের মাথায় হাত রেখে ডমরুবাবা বললেন, "শুভ হোক।"

দর্শকদের কেউ একজন চিৎকার করে উঠলেব, "বোলো বোলো ডমরুবাবা কি—"

অনেকে একসঙ্গে হল্ কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল, "জয়!"

ডমরুবাবা দু'হাত তুলে জনতাকে শান্ত করলেন। এবার ফিরলেন মিস্টার তুলপুলের দিকে। "ভাইসাব, আপনার নাম?"

'রবি তুলপুলে।"

"আপনি কোন্ কাগজে আছেন?"

"সত্য সমাচার।"

আগের উত্তর লেখা কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে শিষ্যের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ডমরুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রশ্নটা কী?"

"আমি কোন্ বছর প্রথম বিদেশে যাই?

"গোটা-পাঁচেক সাল আপনি বলুন। তার মধ্যে প্রথম বিদেশ সালটাও বলবেন। আমি আসল সালটা লিখতে চেষ্টা করব। সাধনা হল গভীর মনঃসংযোগের ব্যাপার। এই ভিড় আর এমন চেঁচামেচিতে আমার মনঃসংযোগই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবু চেষ্টা করে দেখি।

রবি তুলপুলে বলে গেলেন, "১৯৭৮, '৭৯, '৮০, '৮১, '৮২।"

ডমরুবাবার প্যাডে খস্‌খস করে আঁক কাটলেন। লিখলেন। তারপর কলমটা বন্ধ করলেন। "এবার বলুন তো, কোন সালে গিয়েছিলেন?

"১৯৮১ সালে।

"মিস্টার উন্নিকৃষ্ণন, দেখুন তো কোন সাল লেখা রয়েছে ?

"১৯৮১ সাল।

"মিসেস গুপ্তা, তাই তো ? ডমরুবাবা প্যাডটা ধরলেন শীলা গুপ্তার সামনে।

মিসেস গুপ্তা মাথা হেলিয়ে জানালেন উত্তর ঠিকই হয়েছে।

"মিস্টার তুলপুলে, ঠিক সালটা ধরতে পেরেছি তো ?

ছোট খাটো ফরসা মাঝবয়সী রবি তুলপুলে জুলজুলে চোখে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চট্ করে নিচু হয়ে ডমরুবাবার পায়ের ধুলো নিলেন। ডমরুবাবা প্রশান্ত চোখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর উত্তরের কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে ধরিয়ে দিলেন শিষ্যের হাতে।

ঘন-ঘন ডমরুবাবার জয়ধ্বনিতে হল কাঁপতে লাগল। শিবকৃষ্ণ আয়ার ও গোবিন্দ মাকোয়ানাকে আবার মঞ্চে দেখা গেল। দুজনেই ডমরুবাবার পদস্পর্শ করে আশীর্বাদ নিলেন।

আনন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ইশারায় 'সায়েন্স' পত্রিকার সৌরভ পালও উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে দ্রুত এগোলেন মঞ্চের দিকে। পিংকি উত্তেজনায় টানটান হয়ে বসল। প্রীতির বুক ঢিব-ঢিব করতে লাগল।

মঞ্চে উঠে শিষ্যটিকে পাশ কাটিয়ে ডমরুবাবার দিকে এগোলেন আনন্দবাবু ও সৌরভবাবু। হঠাৎ আনন্দবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। কিছু বোঝার আগেই শিষ্যটির হাত থেকে কাগজের গোল্লাগুলো ছোঁ মেরে তুলে নিলেন। অবাক শিষ্যটি মুহূর্তে আনন্দবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু পারল না। সৌরভবাবু ওকে শক্ত হাতে ধরে ফেলেছেন। আনন্দবাবু অতি দ্রুত কাগজের গোল্লা তিনটি তুলে দিলেন রবি তুলপুলে, উন্নিকৃষ্ণন ও শীলা গুপ্তার হাতে।

"কাগজগুলো খুলে পড়ুন আপনারা। উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বললেন আনন্দবাবু।

শীলা গুপ্তার হাতে থাবা মারতে গেলেন ডমরুবাবা। কিন্তু তার আগেই ডমরুবাবার হাত দুটো আনন্দবাবু শক্ত হাতে ধরে ফেললেন।

"কী হল? কাগজে কী লেখা আছে, আপনারা দর্শকদের পড়ে শোনান। আনন্দবাবুর গলায় তীব্র উত্তেজনা।

"আমার কাগজে তো বিভিন্ন জায়গায় '৭৮, '৭৯, '৮০, '৮১, '৮২, পাঁচটা সালই লেখা রয়েছে। অবাক চোখে কথাগুলো বললেন মিসেস গুপ্তা।

মিস্টার তুলতুলে চেঁচিয়ে উঠলেন. "আমার কাগজের এক পিঠের কোণে লেখা রয়েছে—মা মৃত। অন্য কোণে লেখা—বাবা মৃত। আর কাগজের উল্টোপিঠে লেখা রয়েছে—মা বাবা জীবিত।

উন্নিকৃষ্ণন বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন। "এতে এক পিঠের দু'পাশে লেখা রয়েছে ১ এবং ২। আবার ১-এর কিছু তলায় লেখা ৩। ২-এর কিছুটা তলায় ৪। কাগজটার পিছনে লেখা রয়েছে শূন্য।

আনন্দবাবুর মুখে এবার হাসি ফুটেছে। বললেন, "হ্যাঁ, আপনারা এবার ঠিকই দেখছেন। যে উত্তরগুলো হওয়া সম্ভব, তা সবই প্যাডে লিখে রেখেছিলেন ডমরুবাবা। আপনাদের মুখ থেকে উত্তর শোনার পর প্যাডের কাগজ ভাঁজ করে এবং একদিকের লেখা আঙুল দিয়ে ঢেকে রেখে প্রয়োজনীয় উত্তরটা দেখিয়েছিলেন।

না, আর কিছুই বলার সুযোগ পেলেন না আনন্দবাবু। তার আগেই শীলা গুপ্তার প্রচণ্ড একটি চড় এসে পড়ল ডমরুবাবার গালে।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশগানের আলো বিদ্যুৎ-চমকের মতনই ঘন-ঘন চমকাতে লাগল। সমস্ত হল জুড়ে শুরু হয়ে গেছে মহাযোগী সম্মেলন আর ডমরুবাবার মুণ্ডপাত করে ঘন-ঘন শ্লোগান।



গোয়ায় গোলমাল

২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৪, সোমবার।

পিংকির মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বড়দের মধ্যে বড্ড একা লাগছিল। বোম্বাই দূরদর্শনের জনাদশেক লোক আলো, সাউণ্ড ও দুটো ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। একটা ক্যামেরা বসানো হয়েছে ট্রলিতে, আর একটা ক্রেনের উপরে। জুড-আঙ্কল ও যোশেফ আংকল সিল্কের গেরুয়া পরা এক মাঝ-বয়সী সাধুর সঙ্গে কোণের একটা সোফায় বসে বোধহয় কোনও মজাদার গল্প করছেন।

দূরদর্শনের দুজনের সঙ্গে কালই পিংকির আলাপ হয়েছে। একজন সায়েন্স প্রোডিউসার শারদ কাকড়ে, অন্যজন ক্যামেরা ডিপার্টমেণ্টের প্রতিমা দেশপাণ্ডে। দোতলার এই বিরাট হলটার একপাশে দেওয়ালে ঘেঁষে ষোলো ফুট লম্বা বারো ফুট চওড়া একটা পুরু গদি পাতা হয়েছে, তার উপর বিছানো হয়েছে রঙিন কার্পেট। হলঘরটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ক্যামেরা দুটো হলের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলে রাখতে ব্যস্ত।

পাশের একটা ঘরে কয়েকজনের সঙ্গে সম্ভবত শেষ প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিচ্ছেন পিংকির বাবা আনন্দবাবু। মা প্রীতিও অবশ্য ও-ঘরে রয়েছেন, তবে নেহাতই শ্রোতা হিসেবে। ওই ঘরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আজ সকালে পিংকির পরিচয় হয়েছে। এঁরা হলের ভেলোর হাসপাতালের হৃৎপিণ্ড বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিক টেলর, কটক ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ শ্যামসুন্দর মহাপাত্র, কেরল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুধাকর বাবু ও বোম্বাইয়ের বিখ্যাত জাদুকর রত্নাকর মহাজন। এঁরা প্রত্যেকেই উঠেছেন গোয়া সরকারের মিরামার বিচের গেস্টহাউসে। পিংকিরা উঠেছে পানাজির ট্যুরিস্ট হোস্টেলে। গোয়া ট্যুরিজম্, ডিপার্ট-মেণ্টের ম্যানেজার যোশেফ ফার্নাণ্ডেজ অবশ্য আনন্দবাবুকে সপরিবারে গেস্টহাউসে উঠতে অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধ সবিনয়ে সরিয়ে রেখে আনন্দবাবু বলেছিলেন, "একা এলে নিশ্চয়ই গেস্টহাউসে উঠতুম।"

এবারের যাত্রাটা মোটেই শুভ হয়নি। শুরু থেকে কাল পর্যন্ত তিনটে ঘটনা ঘটে গেছে। বিশেষ করে কাল সন্ধের ঘটনাটার পর

পিংকির মনে কেমন একটা আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। বার-বারই মনে হচ্ছে আজও কিছু একটা বড় রকমের গণ্ডগোল হবে।

কাল সন্ধের সময় সমুদ্র-মোহনা দেখিয়ে ফিরছিল ট্যুরিস্ট বোঝাই লাক্সারি লঞ্চটা। লঞ্চের ভিতরে সামনের দিকের একটা ছোট প্লাটফর্মে কয়েকজন তরুণ-তরুণী গিটার আর ব্যাঞ্জো বাজিয়ে নাচ-গান করছিল। ওদের প্রাণখোলা নাচ-গানে সকলেই জমে গেছে। স্টেজের মাঝখান থেকে পিছনের ডেকে ওঠবার সিঁড়ি পর্যন্ত একটা কার্পেট বিছানো। কার্পেট পথের দুপাশে ট্যুরিস্টদের বসার জন্য রয়েছে বেতের চেয়ার। প্রথম সারিতে শারদ কাকড়ের পাশে বসেছিলেন বাবা। মা বসেছিলেন প্রতিমা দেশপাণ্ডের পাশে। তৃতীয় সারিতে কার্পেটের লাগোয়া চেয়ারে বসে ক্যাডবেরি খেতে খেতে পিংকি দেখছিল টিভির জন্য কেমনভাবে ছবি তোলা হচ্ছে। হঠাৎ একজন বাবার কাছে নিচু হয়ে কী যেন বলতে বাবা উঠে লোকটির সঙ্গে লঞ্চের পিছন দিকে গেলেন। পিংকি ঘাড় ঘোরাল। সিঁড়ি বেয়ে লোকটি আর বাবা উঠে গেলেন ডেকে। পিংকিও উঠে দাঁড়াল। বাবা এখন ডেকে, এই সুযোগে পিংকিও ডেকে দাঁড়িয়ে দেখে নিতে পারে সন্ধের পানাজি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে পিংকি যা দেখল তাতে ওর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রেলিং ঘেঁষে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা, আর পিংকির দিকে পিছন ফিরে বাবার বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। লোকটা কী যেন আদেশ করতে বাবা রেলিং টপকে জলে লাফিয়ে পড়লেন। পিংকি দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। লোকটা মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিংকিকে দেখেই জিমনাস্টের মতো ভঙ্গিতে রেলিং টপকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পিংকির চিৎকারে প্রথমেই যিনি দৌড়ে এলেন তিনি হলেন পানাজি প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারী জুড গোমস্। গোমসের সঙ্গে পিংকির প্রথম পরিচয় নয়াদিল্লির আইফ্যাক্স হলে মহাযোগী সম্মেলনে। পিংকির কাছে ঘটনাটা শুনে সারা লঞ্চে হৈ-হৈ পড়ে গেল। লঞ্চ মুখ ঘুরিয়ে চলল আনন্দবাবুর খোঁজে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আনন্দবাবুকে উদ্ধার করা হল। পাঁচ-দশ মিনিট সাঁতার কেটে ভেসে থাকতে আনন্দবাবুর অবশ্য অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু

পিংকি না দেখলে কী হত ভাবতেই শিউরে উঠলেন প্রীতি। যে-লোকটা আনন্দবাবুকে জলে লাফাতে বাধ্য করেছিল, তার খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে, একটা স্পিডবোটকে পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না লোকটিকে তুলে নিতে স্পিড-বোটটা তৈরি ছিল। আনন্দবাবুর উপর হঠাৎ এই আক্রমণের কারণ কিছু বোঝা গেল না। শুধু জানা গেল লোকটা আনন্দবাবুকে বলে-ছিল, "দয়া করে এক মিনিটের জন্য পিছনের ডেকে চলুন, আপনাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।"

আজ চব্বিশে ডিসেম্বর ১৯৮৪, পনেরোই নভেম্বর আনন্দবাবু বোম্বাই দূরদর্শনের শারদ কাকড়ের কাছ থেকে ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটা বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

প্রিয় মহাশয়,

পানাজির বিখ্যাত ব্যাসিলিকা অব বম জেসাস প্রাসাদে আগামী ৩ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পবিত্র মরদেহ ভক্তদর্শকদের দেখার জন্য বের করা হবে। শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও কয়েক লক্ষ ভক্ত সেণ্টের পবিত্র মরদেহ দর্শন করতে এই সময় গোয়ায় হাজির হবেন, কারণ এই দর্শনের সুযোগ প্রতি দশ বছরে শুধু একবারই আসে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি পানাজি সাজবে তাই নতুন উৎসবের সাজে। সেই সঙ্গে এবার পানাজির আর এক আকর্ষণ মহর্ষি সত্যযোগী। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনিও পানাজিতে থাকবেন। মহর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার নানা কথা আজ কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বোম্বাই দূরদর্শনের পক্ষ থেকে আগামী ১ জানুয়ারি উৎসবমুখর গোয়া ও মহর্ষি সত্যযোগীকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র দেখাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য যুক্তিবাদী হিসেবে আপনাকে এবং সেই সঙ্গে চারজন বিজ্ঞানী, ডাক্তার, যুক্তিবাদী ও জাদুকরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ২৪ ডিসেম্বর বিকেলে পানাজিতে আপনার পরীক্ষার ব্যাপারটা ফিল্ম-বন্দী করা হবে। আশা করি আপনার সহযোগিতা পাব।

আপনার যাতায়াত ও পানাজিতে থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমাদের। আপনি টেলিগ্রামে অনুমতি দিলে পরবর্তী কার্যক্রম জানানো হবে।

চিঠির তলায় ছিল আমন্ত্রিত আর চারজনের নাম-ঠিকানা ও শারদ কাকড়ের স্বাক্ষর।

পরদিনই দুটো টেলিগ্রাম পাঠালেন আনন্দবাবু। একটা শারদ কাকড়েকে। জানালেন, ২৩ ডিসেম্বর পানাজি ট্যুরিস্ট হোস্টেলে উঠছি। খরচ পাঠাতে হবে না। অফিসের খরচে যাচ্ছি।

দ্বিতীয়টা পাঠালেন গোয়া ট্যুরিজম ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার যোশেফ ফার্নাণ্ডেজকে। ২৩ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পানাজি ট্যুরিস্ট হোস্টেলে তিন-বিছানার একটা ঘর অনুগ্রহ করে রাখবেন।

চিঠি দিলেন জুড গোমসকে। জানালেন গোয়া যাওয়ার খবর।

আনন্দবাবু ব্যাংক-চাকুরে। যুক্তিবাদী মানুষ। পত্র-পত্রিকায় লেখেন, কয়েকটা বইও আছে। বয়েস চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। ছিপছিপে লম্বা, শ্যামলা রঙ। আনন্দবাবুর সংসার বলতে আর দুজন, স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে পিংকি। প্রীতি রেডিওতে গান করেন ও একটি মেয়েদের পত্রিকায় ফ্যাশান নিয়ে লেখেন। পিংকির বয়েস দশ। এখনই পাঁচ ফুট ছুঁই ছুঁই করছে। সেণ্ট মেরিজে ক্লাস ফোরে পড়ে। এই বয়েসেই বাবার মতো সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করে।

তেরো সংখ্যাটাই যে অপয়া, তা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। তেরো তারিখে যাত্রা শুরুর পর থেকে একের পর এক যেভাবে ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, তাতে এ ছাড়া আর কী বা মনে হতে পারে! অথবা এমন হতে পারে, আচার্যের অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়াটা ঈশ্বরের পছন্দ নয়।

পিংকিদের প্রথম বিভ্রাটটা ঘটেছিল হাওড়া যাওয়ার পথে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও বিডন স্ট্রীটের মোড়ের কাছে। পিংকিদের অ্যাম্বাসডারকে ধাক্কা মারল একটা টুকটুকে লাল মারুতি। কেউ আহত না হলেও গাড়ি হল অচল। তার উপর আবার রয়েছে পুলিশি ঝামেলা। সাংবাদিক বন্ধু কল্যাণ চক্রবর্তী ও কলকাতা

পুলিশের ডি, সি, ট্রাফিকের উদ্দেশে দুটো ছোট্ট চিঠি লিখে আনন্দবাবু তাঁর ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যখন ছাড়া পেলেন, তখন কোথাও খালি ট্যাক্সি নেই। শেষ পর্যন্ত দুটো টানা রিকশায় চেপে যখন স্টেশনে পেঁছলেন, ট্রেন ছাড়তে মাত্র সাত মিনিট বাকি। তার উপর আর এক ঝামেলা। রিকশা থেকে নামতে গিয়ে প্রীতির সিল্কের শাড়িটা গেল ছিঁড়ে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল অজন্তায়। জলগাঁও-এর হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে একটা অ্যাম্বাসাডার ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েছিল পিংকিরা। এই কথা ছিল গাড়ি অজন্তা দেখিয়ে ঔরঙ্গাবাদে পেঁছে দেবে। গুহা-মন্দির দেখে আই, টি, ডি, সি'র ক্যান্টিনে খেয়ে গাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল গাড়ি নিখোঁজ হয়েছে। সেই সঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে পিংকিদের সুটকেস দুটো। তাও ভাগ্য কিঞ্চিৎ ভাল বলতে হবে, টাকা ও ট্রাভেলার্স চেক আনন্দবাবুর সঙ্গেই ছিল। আর দুটি জিনিস ড্রাইভার নিতে পারেনি, তা হল প্রীতির কাঁধের ঢাউস শান্তিনিকেতনের ব্যাগটা ও আনন্দবাবুর ক্যানন ক্যামেরাটা। আনন্দবাবু, প্রীতি বা পিংকি কেউই গাড়ির নম্বরটা খেয়াল করেনি, অতএব করারও তেমন কিছু ছিল না।

সেদিনটা সত্যিই বিচ্ছিরি কেটেছে। অজন্তা থেকে একটা অটো রিকশা ধরে ঔরঙ্গাবাদে হোটেল রিসর্ট'স-এ পেঁছেই ঘর বুক করে দৌড়াতে হয়েছিল বাজারে। কিনতে হল দুটো সুটকেস, পেস্ট, ব্রাশ, তোয়ালে আর তিনজনের জন্যে কিছু পোশাক। হোটোলে ফিরে প্রীতি বললেন, "শুরু থেকেই এত গণ্ডগোল, চলো ফিরে যাই। আমার মন বলছে, না ফিরলে একটা বড় রকমের গণ্ডগোলে পড়তে হবে।"

তারপরই কাল সন্ধেবেলা আনন্দবাবুর উপর হঠাৎ আক্রমণ।

কাল জুড গোমস আনন্দবাবুদের সঙ্গেই ট্যুরিস্ট হোস্টেলের রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ করেছেন। তারপর গোমস তাঁর ফিয়াটে বসিয়ে আনন্দবাবুদের দেখালেন সি-বিচগুলো। সন্ধের আগে দেখা হয়ে গেল আনজুনা, কালানগুটে, বাগাতোড়, বাগমোলা, কলভা

ও মিরামার বিচ। সাড়ে ছটায় হোস্টেলে ফিরে চা খেয়ে হোস্টেলের উলটো দিকেই মাণ্ডবী নদীর বুকে ভাসমান লঞ্চে উঠেছিলেন ওঁরা।

আজ সকালটা কেটেছে মিরামার বিচে গোয়া সরকারের রেস্ট হাউসে। ওখানেই উঠেছেন ডাঃ নিক টেলর, ডঃ সুধাকর বাবু, ডঃ শ্যামসুন্দর মহাপাত্র ও রত্নাকর মহাজন। হোস্টেলে পৌঁছবার কুড়ি মিনিটের মধ্যে এলেন শারদ কাকড়ে ও প্রতিমা দেশপাণ্ডে। তলায় অপেক্ষা করছিল দূরদর্শনের ভ্যান ও বাকি কর্মীরা। পিংকিদের প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন দোনা পাউলা। তিন দিন থেকে সমুদ্র ঘিরে রয়েছে স্থলভূমিকে! সবুজ নারকেল আর নীল আরব সাগর মন ভরিয়ে দেয়।

প্রতিমার অনুরোধে প্রীতি প্রাণ খুলে গোটা পাঁচেক রবীন্দ্র-সংগীত শোনালেন। প্রতিমাও শোনালেন দুটো রবীন্দ্রসংগীত। সুরেলা গলা। প্রতিমা জানালেন, উনি বাংলা পড়তে লিখতে জানেন। ভালবাসেন বাংলা কবিতা। প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ও নীরেন্দ্রনাথ। কালকের মতোই আজও প্রতিমার পরনে চুড়িদার। দু'বছর আগে পুনে থেকে ছবি-তোলায় ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়েছেন।

কাকড়ে বিজ্ঞানে ডক্টরেট, কিন্তু ডানহাতে লাল তাগায় বাঁধা একটা রুপোর তাবিজ। বয়েস পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে। ফরসা, বেঁটে-খাটো চেহারা। সুন্দর ব্যবহার। টিভি টিমের সকলের ব্যবহারই ভাল লেগেছে পিংকির। দুপুরে সমুদ্রস্নান ও সকলের সঙ্গে হৈ-হৈ করে লাঞ্চ-প্যাক খেতেও দারুণ লেগেছে তার।

সন্ধের আগে মিরামার বিচের বাগানঘেরা বিশাল প্রাসাদ ভাস্কো প্যালেসের গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল পিংকিদের ভ্যান। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের একটা জিপ ও একটা ভ্যান। এ ছাড়া রয়েছে তিনটে ফিয়াট। এর মধ্যে একটা পিংকির চেনা, জুড গোমসের।

সাড়ে-সাতটায় আচার্য হলে ঢুকবেন। এখন মিনিট-দশেক দেরি। আচার্য এখন কী করছেন? প্রশ্নটা মনে জাগতেই মনে হল উনি

কোন্ ঘরে থাকতে পারেন ? দেখি তো কী করছেন ?

পিংকি একটার পর একটা ঘর খুঁজে চলল। বাড়িটা বেশ প্রাচীন। বিশাল-বিশাল জানালা, তেমনি বড়-বড় দরজা, প্রায় পনরো ফুট উঁচুতে ছাদ। প্রতিটি ঘরই পুরনো আমলের দামি আসবাবপত্রে সাজানো। এবার পিংকি যে ঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছে তার চার দেওয়ালেই বিরাট-বিরাট চারটে তেলরঙের ছবি টাঙানো। চারটেই জন্তুর ছবি। ছবি পিংকিকে খুব টানে। পিংকি একটা চিত্রকাহিনীর সিরিজ আঁকছে—বার্ডম্যান। এখন নবম অধ্যায়ের কাজ চলছে। বার্ডম্যান একটা ডাকাতের পোষা বাঘের মুখোমুখি পড়ে গেছে। দেওয়ালের ওই বাঘের ছবিটা অপূর্ব। পিংকি এগিয়ে গেল ছবিটার দিকে। চোখ দুটোয় কী প্রচণ্ড হিংস্রতা। ছবিটা দেখতে-দেখতে বিভোর হয়ে যায় পিংকি।

ছবির একটা চোখ কি নতুন করে আঁকা ? পিংকি বাঘের চোখে হাত বুলিয়ে চমকে ওঠে, একী ! এ যে এক টুকরো আলাদা ক্যানভাসে চোখটা আঁকা। টুকরোটা ছবির ক্যানভাসের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো রয়েছে যে, মুদির দোকানের ঝাঁপের মতোই ওঠানো-নামানো যায়।

ক্যানভাসের টুকরোটা উপরের দিকে তুলতেই দেখতে পেল একটা গোল কাঁচ। কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাল পিংকি। দেখতে চাইল কিছু দেখা যায় কি না।

আরে ! এটা যে একটা পেরিস্কোপ ! নিশ্চয়ই কোনও পোর্তুগিজ সাহেবের কীর্তি। কোনও একটা ঘরের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। ওই তো আচার্য সত্যযোগী। আজই 'গোয়া নিউজ' পত্রিকায় ওঁর ছবি দেখেছে পিংকি। কিন্তু ওটা কী করছেন আচার্য ! উত্তেজনায় ঘেমে ওঠে পিংকি।

ধবধবে সাদা বিশাল গদিতে পদ্মাসনে বসে আছেন আচার্য সত্যযোগী। হাত দুটো কোলের উপর রাখা। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, আবার পঞ্চান্নও হতে পারে। পরনে গেরুয়া সিল্কের আলখাল্লা। কুচকুচে কালো চুল, দাড়ি, গোঁফ। টকটকে গায়ের রঙ। তীক্ষ্ম নাক।

আচার্যের ডানপাশে বসে রয়েছেন তাঁর প্রধানা শিষ্যা মা জয়লক্ষ্মী। কিছুটা তফাতে গদির উপরেই বসে পাঁচ পরীক্ষক ও পিংকি। গদির ফুট কুড়ি দূরে কয়েকটা সোফা পাতা। তাতে বসে প্রীতি, যোশেফ ফার্নান্ডেজ, জুড গোমস ও আচার্যের এক শিষ্যা।

মা-জয়লক্ষ্মীকে দেখতে দুর্গা প্রতিমার মতো। শুধু তফাতের মধ্যে পরনে সিল্কের গেরুয়া আলখাল্লা। সাউন্ড টেক করছে দু'জন। ট্রলির ক্যামেরাটা এগিয়ে এল জয়লক্ষ্মীর দিকে। জয়লক্ষ্মী হিন্দিতে বলে চলেছেন, "যতক্ষণ মানুষের হৃৎপিণ্ড চালু থাকে, ততক্ষণ হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের তালে তাল রেখে হাতের বুড়ো আঙুলের নীচে কব্জির রেডিয়াল ধমনীও সংকুচিত-প্রসারিত হতে থাকে। চলতি কথায় একেই বলি নাড়ির স্পন্দন। নাড়ির এই স্পন্দন বন্ধ হওয়া মানেই মৃত্যু। সাধারণভাবে নাড়ি প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত একবার স্পন্দিত হয়। কোনও মানুষ তার ইচ্ছেমতো নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করতে পারে এবং চালু করতে পারে, এটা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। কারণ, বিজ্ঞানের যুক্তিতে এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। আর এই ব্যাখ্যাহীন ঘটনাই যোগের দ্বারা ঘটিয়ে দেখাবেন আচার্য সত্যযোগী। তিন মিনিটের জন্যে তিনি তাঁর নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করে দেবেন এবং নিজেই আবার চালু করবেন। অর্থাৎ, নিজেই মরবেন এবং নিজেই নিজের জীবন দান করবেন। আচার্যদেবের এই যোগ-সাধনাকে পরীক্ষা করতে বোম্বাই দূরদর্শনের আমন্ত্রণে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ।"

মা-জয়লক্ষ্মী তাকালেন আচার্যদেবের দিকে। তারপর পরীক্ষকদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "এইবার আপনারা আচার্যদেবকে পরীক্ষা করে দেখুন তো, নাড়ি পাচ্ছেন কি না?"

তিন মিনিট মাত্র সময়, অতএব দ্রুততার সঙ্গে পরীক্ষার কাজটা সারতে হবে। কথাটা শেষ হতেই আচার্যের সবচেয়ে কাছে-বসা ডঃ মহাপাত্র আচার্যের ডান হাতের কব্জির রেডিয়াল ধমনীটা নিজের চার আঙুলে চেপে ধরলেন। ট্রলির ক্যামেরা এগিয়ে এল।

ঘড়ি ধরে দশ সেকেণ্ড দেখে দু'দিকে মাথা নাড়লেন ডঃ মহাপাত্র। অর্থাৎ কোনও স্পন্দন নেই।

পঁচিশ সেকেণ্ড পরীক্ষার পর হৃৎপিণ্ড-বিশেষজ্ঞ ডঃ কার্টার যখন আচার্যের কব্জি থেকে হাত ওঠালেন, তখন তাঁর দু'চোখে গভীর বিস্ময়।

ডঃ বাবু আচার্যের হাত থেকে হাত উঠিয়ে শুধু একটা কথাই বললেন, "এ মির‍্যাক্‌ল্‌ !"

জাদুকর মহাজন কিন্তু তিনজনের মতো ডান হাতের নাড়ি দেখলেন না, দেখলেন বাঁ হাতের নাড়ি, সত্যিই নাড়ি বন্ধ। মহাজন এই প্রথম অনুভব করলেন, সত্যিই অলৌকিক বলে কিছু আছে।

এখন শেষ পরীক্ষক আনন্দবাবুর পালা। পিংকি এতক্ষণ বাবার পাশে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের ডান হাতের নাড়ি বাঁ হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিল। আনন্দবাবুকে উঠতে দেখেই বলল, "বাবা, আমিও নাড়ি বন্ধ করতে পারছি।"

পিংকির কথায় আর কেউ না-চমকালেও চমকে উঠলেন আনন্দবাবু। আচার্যের নাড়ি পরীক্ষা না করে পিংকির নাড়ি টিপে ধরলেন, তারপর প্রচণ্ড উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন, "আপনারা, "আপনারা দেখুন, ওর নাড়ি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে।"

ডাঃ টেলর, ডঃ মহাপাত্র, ডঃ বাবু ও রত্নাকর মহাজন প্রত্যেকেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন পিংকির উপর। একে-একে ওঁরা নাড়ি দেখলেন। সত্যিই আশ্চর্য ! নাড়ি পাওয়া যাচেছ না। মনে হল, ওঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট উত্তেজিত। উত্তেজনা মা-জয়লক্ষ্মীরও চোখে-মুখে।

আনন্দবাবু পিংকিকে বললেন, "এবার নাড়ির গতি স্বাভাবিক করো তো।"

মুহূর্তের মধ্যে নাড়ির গতি স্বাভাবিক করে ফেলল পিংকি। আনন্দবাবুর অনুরোধে ডাঃ টেলর পরীক্ষা করে বললেন, "অদ্ভুত। আজ আমার মাথাটাই দেখছি খারাপ হয়ে যাবে!"

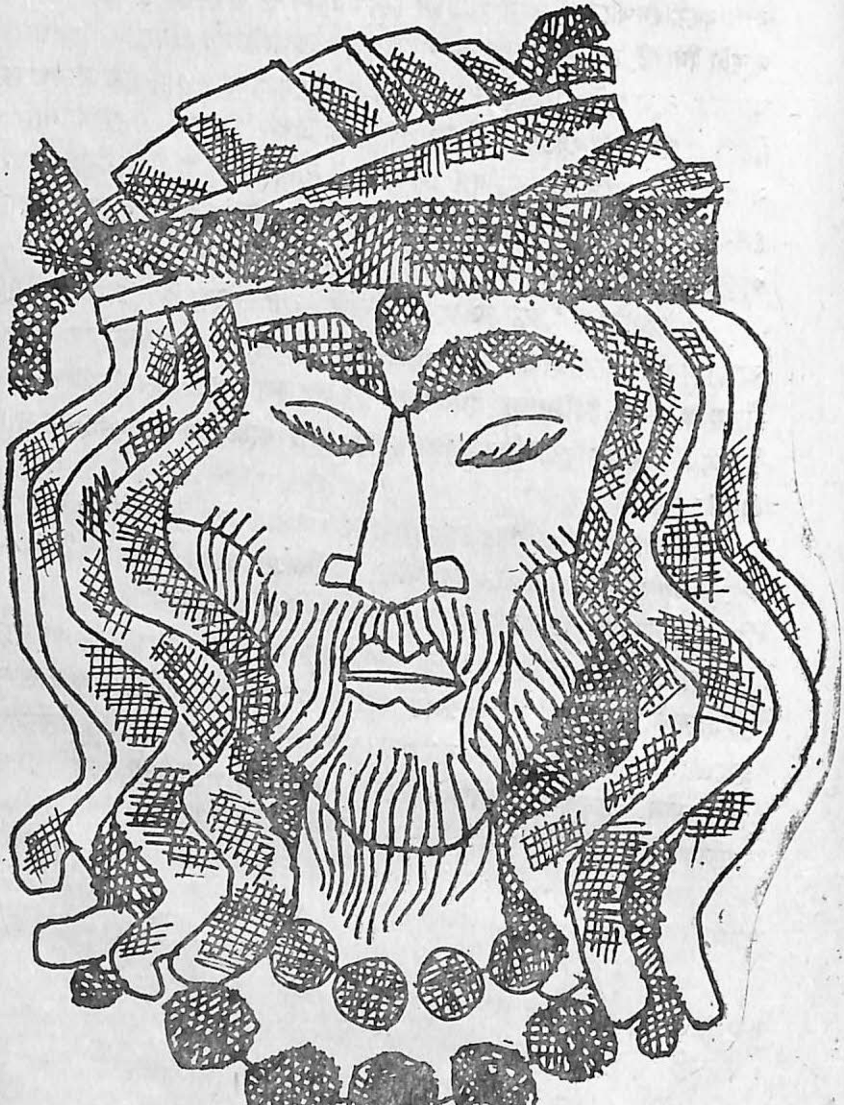
পিংকি এবার মুখ খুলল, 'না, না, এর পিছনে অলৌকিক কিছুই নেই। হঠাৎ আমি দেখে ফেলেছি আচার্য এখানে আসার আগে দু'বগলে দুটো ছোট কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে নিলেন। বগলে কাপড়ের পুঁটলি দুটো দিলেন কেন ? দিলে কী হয় ? আচার্য তো এখন নাড়ির স্পন্দন

বন্ধ করে দেখাবেন, তবে পুঁটলি নিয়ে এমন ব্যস্ত হলেন কেন? পুঁটলি দুটো দিয়েই নাড়ি বন্ধ করেন না তো? কথাটা মনে হতেই আমিও আমার রুমালটা ছিঁড়ে দু টুকরো করে গোল করে পাকিয়ে দুবগলে দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি, কিন্তু পারিনি, এখন আচার্য দেবকে নাড়ি বন্ধ করতে দেখে ওর কায়দায় যে-হাতের নাড়ি যখন পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে-হাত তখন বুকের পাশে চেপে ধরছি, বগলের পুঁটলিতেও চাপ পড়ছে, আর তাইতেই দেখছি নাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

ডাঃ টেলর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওঃ, যোগীবাবা কী বোকাটাই না আমাদের বানিয়েছিলেন? বগলের তলার অ্যাক্সিলারি ধমনীতে চাপ দিয়ে কব্জির রেডিয়াল ধমনীতে রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। এবার যোগীবাবা আপনার হাত দুটো উপরে তুলুন তো। একটু দেখি।"

না, শেষ পর্যন্ত আর দেখা হল না। তার আগেই যোগীবাবা উঠে পড়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে দৌড়লেন নিজের ঘরের দিকে। পিছন-পিছন দৌড়লেন মা-জয়লক্ষ্মী ও সোফায়-বসা আচার্যের শিষ্যা।

দু'টো ক্যামেরাই ওঁদের অনুসরণ করছিল। শারদ কাকড়ে চেঁচালেন, "কাট্।" তারপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে ডান হাতের লাল তাগা-বাঁধা রুপোর তাবিজটা ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারলেন পলায়মান তিনজনকে লক্ষ করে। তাবিজটা গতকালই দিয়েছিলেন আচার্য সত্যযোগী।



আগরতলায় গড়বড়

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭।

মুহূর্তে সচেতন হয়ে আনন্দবাবু ব্লেজারের ডান পকেটে হাত ঠেকাতেই একটা কী যেন হাতে ঠেকল, হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করলেন। বুঝতে অসুবিধে হলো না—একটা ক্যাসেট। কিন্তু, এটা এমনিভাবে গোপনে পকেটে ফেলে দেওয়ার অর্থ? লোকে পকেট মারে, পকেটে কিছু চালানও করে, এমন অভিজ্ঞতা—সত্যিই বিচিত্র!

উত্তেজনা চেপে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেন বাইরের দিকে। না, প্রীতি কোথাও নেই। ও কী ফিরে গেছে? সম্ভবত নয়, হয়ত এখন ভিড়ের মধ্যের একজন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্লেন উড়ে গেলে ফিরবে।

পিংকি বাবার পাশে সিট পায়নি। এমন কি জানালার পাশেও নয়। আনন্দবাবু একাই আগরতলা যাবেন এমনিই ঠিক ছিল, টিকিট কাটাও হয়ে গিয়েছিল। গত শুক্রবার আনন্দবাবু অফিস থেকে ফিরতেই পিংকি জানালো, আগামী সাত দিন ওদের স্কুল বন্ধ থাকবে। —কেন? না, ওদের স্কুলের জলের ট্যাঙ্কে বেড়াল মরে পড়েছিল। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সুবাদে ছুটি। অতএব বায়না, "আমিও আগরতলা যাব।"

আনন্দবাবু তো গিরিমহারাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সঙ্গী হিসেবে পিংকিকে নেওয়ার জন্য আগে থেকেই পা বাড়িয়েই ছিলেন। বাদ সেধেছিলেন স্রেফ্ প্রীতি, "তোমার আর কী, ছেলে পড়ল কী না পড়ল তাতে তোমার কী? ওর কোন বই-পত্তর একদিনের জন্যও নেড়ে চেড়ে দেখেছ? সাত দিন ক্লাস না করলে কী হবে জান? আর দেড় মাস পরে ফাইনাল, এ সময় সাজেশন-টাজেশন দেবেন টিচাররা। তোমার যে কী সব বুদ্ধি না। তুমি যাচ্ছ যাও, তোমার ওসবে কখনও বাধা দিতে আসি না; কিন্তু তোমার সব কাজে পিংকিকে নিয়ে টানা-টানি করলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।"

প্রীতির রাগ যে ভাবে চড়চড় করে বাড়ছিল, তাতে কুরুক্ষেত্রই হয়ে যেত। সে সময় প্রীতির দুই বান্ধবী গোধূলি আর শ্রীপর্ণা এসে

গেলেন, তাই রক্ষে। মা'র রাগ মুহূর্তে জল হয়ে গেল, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল খুশির উচ্ছ্বাস। আর পিংকি বেচারা বিরস মুখে পড়তে বসল। গোধূলি মাসি পড়ার ঘরে এসে একটা হামি খেয়ে ক্যাডবেরিস তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। শ্রীপর্ণা মাসি দিলেন একটা হাতে-বানানো মস্ত কেক। অন্য সময় হলে পিংকি বেজায় খুশি হত, আজ হতে পারল না। মাসিদের সৌজন্যতা দেখাতে মেপে হাসল।

হঠাৎ ছুটিটা পেয়ে যাওয়ায় পিংকির দারুণ আনন্দ হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই মাকে ম্যানেজ করতে পারবেন বাবা। এ খাবারটা বানাও, ও খাবারটা বানাও, খাবার সময় পাশে বসে মুখে খাবার তুলে দাও, পড়ার সময় পাশে বসে থাক, ঘুমোবার সময় চুলে বিলি কেটে দাও, সাত-সতের বায়না সবই মায়ের কাছে ; কিন্তু বেড়ানোর কথা উঠলেই লক্ষ্মী মার্কা মা আগ মার্কা চণ্ডী হয়ে উঠেন। মায়ের ব্লাডপ্রেসার, অতএব মায়ের শরীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই চুপ করে থাকতে হয়।

পিংকির বায়না শুনে আনন্দবাবু অভয় দিলেন, "দাঁড়া, আগে তোর মাকে ম্যানেজ করি।"

শেষ পর্যন্ত ম্যানেজও করে ফেললেন। শনিবার ট্রাভেলিং এজেণ্টকে ফোন করে টিকিটের ব্যবস্থাও করলেন, তবে সিট পাশাপাশি পাওয়া গেল না, এই যা।

প্লেন দৌড়তে শুরু করতেই দেখা গেল পিংকি উঁকি-ঝুঁকি মেরে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। আনন্দবাবুও জানালার পাশে সিট পাননি, অতএব বাবার সঙ্গে যে সিটটা পাল্টে নেবে সে সুযোগও নেই।

"তুমি আমার সিটে বসবে ?" পাশের সিটের মহিলাটি পিংকিকে জিজ্ঞেস করলেন। যিনি প্রশ্ন করলেন, পিংকি আগেই তাঁকে লক্ষ্য করেছে। প্রথম তাকিয়েই মনে হয়েছিল যেন 'গার্ডেন ভারেলি' অ্যাড-ফিল্মের নায়িকা। ঝকঝকে হাসিখুশি তলোয়ারের মত শার্প চেহারা। বব্ করা চুল, লম্বায় পাঁচ সাড়ে সাত হবে। এক সময় পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায় পিংকি লক্ষ্য করেছিল মেয়েটি ওর চেয়েও ইঞ্চিখানেক বেশি লম্বা। গলার সরু সোনার চেনে ঝোলান ক্রস দেখে পিংকির বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ও খ্রিশ্চান। পরণে চুড়িদার দেখে কোন

প্রদেশের মানুষ, বুঝে উঠতে পারেনি। এখন স্পষ্ট বাংলা শুনে বুঝতে পারল বাঙালী।

"থ্যাংক ইউ।"

পিংকি বিনয় দেখিয়ে সুযোগ ছাড়তে নারাজ। অনেক উঁচু থেকে তলার বাড়ি, গাছপালা, মাঠ, ধানক্ষেত, নদী কেমন লাগে দেখতে ইচ্ছে খুব। শেষে প্লেনে চড়েছে টুয়ে পড়তে। সেবার পোর্টব্লেয়ারে গিয়েছিল, কিছুই মনে নেই, এমন কী, জানালার পাশে বসেছিল কি না, তাও মনে নেই।

"বেড়াতে যাচ্ছ?"

"তা একরকম বলতে পারেন। বাবা একটা কাজে যাচ্ছেন। এই সপ্তাহটা আমাদের স্কুল ছুটি। তাই বাবার সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। "আপনি কী ত্রিপুরায় থাকেন?" পিংকি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল।

"না, কলকাতায় থাকি। আগরতলায় দাদা থাকেন। তাঁর কাছেই যাচ্ছি। দাদা গিরিমহারাজের দারুণ ভক্ত। মহারাজের নাকি অদ্ভুত সব ক্ষমতা। আমি অবশ্য কোনদিনই দেখিনি। দাদার কাছেই শুনেছি। দিন দশেক আগে দাদা ফোনে খবর দিলেন আগরতলায় চলে আয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রেস ক্লাবে গিরিমহারাজ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় আত্মাকে এনে দেখাবেন র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিকে। ভদ্রলোক নাকি মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। খবরটা পেয়ে ঠিক করে ফেললাম, এমন একটা দারুণ ঘটনা নিজের চোখে দেখার সুযোগ ছাড়ব না।"

পিংকি এবার মুখ ঘোরাল। "আমরাও তো গিরিমহারাজের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতেই যাচ্ছি।"

"তোমার মা-বাবা ওঁর শিষ্য বুঝি?"

"না, বাবাই চ্যালেঞ্জ করেছেন।" কথাটা বলতে গিয়েও পিংকির বুক গর্বে অন্তত দেড় ইঞ্চি বাড়তি ফুলে ওঠে।

'তোমার নাম কি তবে পিংকি?"

'হ্যাঁ ডাক নাম পিংকি, ভাল নাম পিনাকী। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?"

মেয়েটি দুষ্টু চোখে হাসলেন। বললেন, "আরও অনেক কিছু জানি। তোমার বাবার নাম আনন্দ ঘোষ। কী ঠিক বলিনি ?"

"আপনি কী আমাদের চেনেন ?" পিংকি রহস্যটা ধরার চেষ্টা করে।

"উঁ-হু। তবু তোমাদের সম্বন্ধে কত কিছু বলে দিলাম। আরও বলব ? তোমার বাবা ব্যাঙ্কে কাজ করেন এবং লেখেন। তোমার মা প্রীতি রেডিওতে গান করেন। কী, সব ঠিক বলছি তো ?"

পিংকি এতক্ষণে রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। বুঝে ফেলেছে ইনি আনন্দমেলার পাঠিকা। তাইতেই বাবা র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোশিয়েশনের সম্পাদক জানার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের অনেক তথ্যই জানা হয়ে গেছে। কারণ আনন্দবাবুর ও পিংকির কিছু গল্প ইতিমধ্যেই আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়েছে।

রূপকথার পরীর মত দেখতে মেয়েটি মুক্তোর মত দাঁত বের করে হাসলেন। বললেন, "দেখলে, তোমাদের ফ্যামিলির সম্বন্ধে কত কিছু বলে দিলাম ! খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না ?"

"আমিও আপনাকে অবাক করে দিতে পারি, আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিয়ে। আপনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনো করেছেন। সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল বাংলা, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজও বাংলা, আনন্দমেলা পড়েন, চাকরী করেন।"

হাততালি দিয়ে উঠলেন ছবির মত মেয়েটি। পিংকি এঁকে আণ্টি বলবে, কী দিদি বলবে এখনও ঠাওর করে উঠতে পারেনি।

'দারুণ বলেছ। একটা ছাড়া সব ঠিক। আমি বাঙালি নই, কেরালার মেয়ে, নাম—কাদম্বরী ডায়াস।"

পিনাকী সত্যিই অবাক হয়েছে। বলল, "একেবারে বাঙালির মত বাংলা বলেন তো ?"

"বাঃ, বলব না। জন্ম থেকেই তো আমি কলকাতায়।"

একজন এয়ার হোস্টেস এসে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে পিংকি ও কাদম্বরীর সামনে একমুঠো লজেন্স মেলে ধরলেন, সস্তা-লজেন্স।

কাদম্বরী বললেন, "নো, থ্যাঙ্কস্।"

পিংকি 'নো থ্যাংকস' বলতে গিয়েও না বলে দুটো লজেন্স তুলে নিল।

আনন্দবাবু তাঁর সনিও পকেট টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেটটা গুঁজে দিয়ে হেড-ফোনের সাহায্যে হঠাৎ-পাওয়া ক্যাসেটটার প্রতিটি কথা শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। ক্যাসেটে বেজে চলেছিল, "দৈনিক বার্তার যে গাড়িটা আপনাকে নিতে আসছে, তাতে উঠবেন না. বিপদ ঘটবে। আপনি বুদ্ধিমান, আমার কথাকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেবেন।" মিনিট দুয়েকের ক্যাসেটটায় বার দশেক ওই একই কথা বলা হয়েছে।

আনন্দবাবু টেপটা বন্ধ করলেন। হেড-ফোনটা কান থেকে নামিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে চোখ বুজলেন। চোখ বুজলে মনসংযোগটা ভাল হয়। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, এই প্লেনেই কেউ একজন যাচ্ছেন, যিনি ক্যাসেটটা ফেলে দিয়েছেন। তিনি এও জানেন, আমি এইসব পরিস্থিতিতে ছোট টেপ-রেকর্ডার সঙ্গে রাখি। কাগজে সাবধান-বার্তা লিখে পকেটে ফেলে দিলে সে বার্তা এই প্লেন যাত্রার একটিমাত্র ঘণ্টায় আমার নজরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি, এটা ধরে নিয়েই সাবধান বার্তা ক্যাসেট বন্দী করে আমার ব্লেজারের পকেটে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। জানতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই ব্লেজারের পকেটে হাত দেব এবং ক্যাসেটের অস্তিত্ব টের পাব। ক্যাসেটে কোনও খবর পাঠান হয়েছে ধরে নিয়ে সেটা যে প্লেনেই শুনবো, এ-বিষয়েও উনি যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলেন। যিনি এ-কাজ করেছেন, তিনি জানতেন আমি কবে কোন্ ফ্লাইটে যাব। এও জানেন দৈনিক বার্তা আমাকে নিতে গাড়ি পাঠাচ্ছে। হয়ত আরও অনেক কিছু জানেন। বাস্তবিকই যদি এটা সাবধান বাণী হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে বন্ধুটি আমার শত্রুপক্ষের শক্তি সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন; তাই মুখে সাবধান করার ঝুঁকিও নিতে চাননি।

দৈনিক বার্তার সম্পাদক অমিতবিক্রম দেবনাথ গাড়ি পাঠাবেন এয়ারপোর্টে। গাড়িতে কী ধরনের বিপদ অপেক্ষা করতে পারে? এই ধরণের উটকো খবরকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত? কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগলো আনন্দবাবুর মাথায়।

এটা কী সহযোগিতা ? ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা ? না কি ফাঁদ ? অমিতের পাঠান গাড়িতে না গেলে শত্রুপক্ষের ট্যাক্সিতেই যাতে উঠি সে ধরনের নিশ্চয়ই কোন সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা থাকবে। কাদের কাছ থেকে আক্রমণ আসতে পারে ? গিরিমহারাজের কাছ থেকে ? যাতে আমি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা গ্রহণ করতে না পারি। পিংকিকে না নিয়ে এলেই বোধহয় ভাল হতো। আনন্দবাবু তাকালেন পিংকির দিকে। পিংকি তখন হাত নেড়ে কী যেন বক্‌বক করে চলেছে।

আগরতলা এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যান্ড করল। প্লেন থেকে নেমেই চারপাশে চোখ বোলাল পিংকি। ছোট্ট এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্টের পশ্চিমে দেওয়াল তোলা। দেওয়ালের ওপাশেই বাংলা দেশ। পিংকি গত শনিবারই ম্যাপে দেখেছে, ওটা কুমিল্লা জেলা।

পিংকি আশা করেছিল, এখানে বেশ শীত থাকবে। শীত শীত একটা ভাব থাকলেও এই সকাল সাতটা নাগাদও তেমন শীতের কামড় অনুভব করল না।

পিংকিদের মালপত্র বলতে দুটো মাঝারি আকারের ভি. আই. পি. সুটকেশ। একটা পিংকির হাতে, একটা আনন্দবাবুর হাতে। অতএব মালের জন্য অপেক্ষা করার ঝামেলা ছিল না। পিংকিকে নিয়ে এয়ার পোর্টের রেস্তোরাঁটায় ঢুকলেন আনন্দবাবু। ডবল-পোচ, টোস্ট আর কফি শেষ করে দ'জনে যখন বাইরে পা বাড়ালেন তখন পঁয়তিরিশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল খোলা মাঠের মত জায়গায় কয়েকটা অটো রিক্সা, মোটর ও ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা গাড়ির দিকে চোখ পড়ল পিংকির। সাদা ফিয়াট। সামনের উইন্ড স্ক্রিনে কাগজ সাঁটা। মোটা-মোটা হরফে লেখা রয়েছে 'দৈনিক বার্তা'।

পিংকি বাবাকে বলল, "দৈনিক বার্তার গাড়ি ওই যে।" পিংকি গাড়ির দিকে আঙুল তোলার আগেই আনন্দবাবু ওর হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখেছি। ওটায় আমরা যাচ্ছি না, আমার সঙ্গে এসো।"

আর কিছু বলতে হলো না। পিংকি কোন প্রশ্ন না করে বাবার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। বাবার কথাতে রহস্যের গন্ধ পেয়েছে পিংকি। বাবার উপর পিংকির ভীষণ আস্থা। বাবা যে আবেগের বশে উদ্ভট কিছু করেন না, সেটা ও জানে। দৈনিক বার্তার গাড়িটাকে এড়িয়ে যাবার মত কারণ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ঘটেছে। কাল রাতেই বাবা অমিতবিক্রমের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন। বাবা বলছিলেন, "তুমি বা দেবাঞ্জন কোন কারণে না আসতে পারলেও অসুবিধে হবে না। যে গাড়িই পাঠাবে তার উইন্ড স্ক্রিনে তোমার পত্রিকার নামটা সেঁটে রেখো, আমি ঠিক খুঁজে নেব।"

পিংকি আর আনন্দবাবুকে দেখে দু-একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন স্যার?" এরা ট্যাক্সি বা অটো ড্রাইভার। আনন্দবাবু কারও কথার উত্তর না দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি পার হয়ে এক সময় একটা গাড়ির কাছে এসে থামলেন।

"সার্কিট হাউসে যাবেন?" আনন্দবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভার দরজা খুলে ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো। উৎসাহিত গলায় বলল, "নিশ্চয়ই যাব স্যার।"

ড্রাইভার সুটকেশ দুটো হাত থেকে নিতে এগিয়ে এলো। তার আগেই আনন্দবাবু গাড়িতে উঠে পড়লেন তৎপরতার সঙ্গে। পিংকিও একটুও দেরি না করে উঠে পড়ল। ও বুঝতে পেরেছে অমিতকাকু বা দেবাঞ্জনকাকুর যেহেতু আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ওঁদের দৃষ্টি এড়াতেই বাবার এই তৎপরতা।

পিংকি বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল কাদম্বরীকে। একটা ট্যাক্সির দিকে এগুচ্ছেন।

"বাবা, ওঁকে তুলে নেব?"

পিংকির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন আনন্দবাবু। তারপর পিংকির দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন মৃদু হেসে। ড্রাইভারকে বললেন, "একটু দাঁড়ান প্লিজ।" পিংকিকে বললেন, "যা, দৌড়ে ওকে নিয়ে আয়।"

পিংকি এক দৌড়ে কাদম্বরীর কাছে গিয়ে ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বলল, "আন্টি, চল আমাদের ট্যাক্সিতে যাবে।"

আনন্দবাবু কাদম্বরীকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "আমার ছেলের সঙ্গে তো আপনার আগেই পরিচয় হয়ে গেছে, আমার সঙ্গেও যেতে যেতেই হয়ে যাবে। আপনাকে রিসিভ করার জন্য কারও আসার কথা ছিল বুঝি।"

কাদম্বরী বললেন, "দাদার আসার কথা ছিল। আপনাকে অবশ্য চিনি। আই মিন, আপনার নামের সঙ্গে আমি অনেক আগের থেকেই পরিচিত।"

কথায় কথায় কাদম্বরীর আরও পরিচয় পাওয়া গেল। বাবা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের পাইলট। আগরতলায় দাদার একটা ওষুধের দোকান আর হোটেল আছে। দোকানটার নাম 'মেডিকো', হোটেলের নাম 'অপ্সরা'। ২৮ বেডের দোতলা হোটেল। তিনতলায় তিনটে ঘরের অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে দাদা থাকেন। কাদম্বরীর পড়াশুনো কলকাতাতেই। লরেটো থেকে গ্রাজুয়েট। একটা বিদেশী কোম্পানির কলকাতা অফিসের রিসেপ্সনিস্ট।

"কলকাতা থেকে তোমার দাদা আগরতলায় এলেন কেন, ব্যবসা করতে?" পিংকি জিজ্ঞেস করল কাদম্বরীকে।

"কেন এলো বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, এখানে এসে ভালই করেছে। আগে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ-এর কাজ করত। ত্রিপুরা, অসম জোন্‌টা ঘুরতে হত। তখন প্রায়ই বলত, ওই জোন্‌টা দারুণ ভাল। একটা মেডিসিনের দোকান খুললে লালে লাল হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেভেনটি সেভেন-এ আগরতলায় দোকান খোলে 'মেডিকো'। এইট্টিটুতে 'অপ্সরা' হোটেলটা কিনে নেয়। এই কয়েক বছরে হোটেলটাকে ধীরে ধীরে অনেক বাড়িয়েছে।

"তুমি নিশ্চয়ই এর আগেও এখানে এসেছ?" পিংকি দু'দিকের গাছপালা আর লাল মাটির সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করল।

কাদম্বরী বললেন, "আমি এখানে বছরে অন্তত বার দুয়েক আসি, চেনা জায়গা, খবর না দিয়ে এলে ট্যাক্সি নিয়ে নিই। খবর দেওয়া থাকলে দাদাই হাজির থাকেন।"

রাস্তার দু'দিকেই প্রচুর গাছ। দু-এক কিলোমিটার পরে পরেই

একটা করে ছোট্ট গ্রাম চোখে পড়ছে।

ট্যাক্সি ঢুকল সার্কিট হাউজের কম্পাউণ্ডে। বাগানের নানা রঙের গোলাপ প্রথমেই চোখ টানে। হলদে রঙের সাদামাটা দোতলা লজ। ট্যাক্সি থেকে বেরুলেন আনন্দবাবু, সেই সঙ্গে পিংকি ও কাদম্বরী। একতলার অফিস ঘরে তখনও তালা ঝুলছে। এনকোয়ারি কাউণ্টারে কেউ নেই। শুধু একটা ফোন শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালগুলো ত্রিপুরার বাঁশের কাজে প্রায় ঢাকা। একটু এগিয়ে ডাইনিং হল। ত্রিপুরার নিজস্বতা বজায় রেখে বাঁশের নানা উপকরণে সুন্দর করে সাজান। হলের পরেই কিচেন। এখানে একজনের দেখা মিলল। আনন্দ ঘোষের নামে কোনও রুম বুক করা আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় লোকটা জানাল, "ওদিকের বারান্দায় দেখুন, একটা বোর্ডে রিজারভেশন চার্ট টাঙান আছে।"

বোর্ডে প্রতিটা ঘরের নম্বরের পাশেই একটি করে নামের কার্ড লাগান রয়েছে। আনন্দ ঘোষেব নাম কোথাও পাওয়া গেল না। অথচ আজ থেকেই সার্কিট হাউজে ডবল বেডের রুম বুক করা থাকবে বলেই অমিত জানিয়েছিল।

গেটের সামনে সাইকেল থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির কম নয়। রোগা, কালো, পরণে ব্যানলনের ফুল প্যাণ্ট ও হাফ-হাতার বুশ সার্ট, পায়ে চপ্পল। সাইকেলটাকে দেওয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে এগোলেন ম্যানেজার রুমের দিকে, চাবি বার করে ঘর খুলতেই আনন্দবাবু এগিয়ে গেলেন, "আপনিই কী ম্যানেজার ?"

নিরস গলায় ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমার নাম আনন্দ ঘোষ। আজ থেকে ফার্স্ট মার্চ পর্যন্ত আমার নামে রুম রিজার্ভ করা আছে বলে জানিয়েছিলেন দৈনিক বার্তার এডিটর অমিতবিক্রম দেবনাথ। অথচ আমার নাম তো রিজারভেশন চার্টে দেখছি না।"

ভদ্রলোক নিরাসক্ত গলায় বললেন, "শুনলাম কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। আজ যাঁদের নামে লিস্ট পেয়েছি, টাঙিয়ে দিয়েছি।"

"এখান থেকে একটা ফোন করতে পারি ?"

"কোথায় করবেন ?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন।

"দৈনিক বার্তার অফিসে।"

"বেশ তো করুন, নম্বরটা জানা আছে ?" পরবর্তী উত্তরের প্রত্যাশা না করেই একটা নম্বর ডায়েল করে রিসিভারটা আনন্দবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

অমিতকে পাওয়া গেল না। দেবাঞ্জনকে পাওয়া গেল। দেবাঞ্জন তরুণ সাংবাদিক। ফোনের অপরপ্রান্তে আনন্দবাবু আছেন শুনে অবাক গলায় বললেন, "আপনি সুস্থ আছেন তো ? কোথা থেকে ফোন করছেন ?"

দেবাঞ্জনের কথায় বিস্ময় ও উত্তেজনা লক্ষ্য করে আনন্দবাবু বললেন, "ঠিকই তো আছি। আমি সার্কিট হাউজ থেকে কথা বলছি। সার্কিট হাউজে আমার নামে কোনও রুম রিজার্ভ করা নেই দেখে ফোন করছি।"

"সে কী ? আপনি আমাদের গাড়িতে আসেননি ?" দেবাঞ্জনের কথায় তখনও বিস্ময়ের ঘোর।

"না, একটা ট্যাক্সি ধরেই এসেছি।"

"পিংকিও আপনার সঙ্গেই আছে তো ?"

"হ্যাঁ, সে তো আছে, কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"একটু আগে পুলিশ মেসেজ পেয়েছি, আমাদের গাড়িটাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে কে বা কারা আক্রমণ চালায়। গাড়িটা বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। দুটো বডিও পাওয়া গেছে। পুলিশের অনুমান তাঁরা গাড়িরই আরোহী। বডি দুটোকেও গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। খবর পেয়েই অমিতদা নিজেই দৌড়েছেন। আমরা প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি ও পিংকি গাড়িতে থাকলে চারটে বডি পাওয়ার কথা। চারজনের দু'জন কে কে ? আর দুজনই বা গেল কোথায় ? আমরা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখানে এখন বইমেলা তার উপর আপনার চ্যালেঞ্জ দেখতেও বাইরের থেকে ভি. আই. পি-রা আসছেন, সব হোটেলেই এখন বেজায় ভিড়। অমিতদা ফিরে এসে দরকারে চীফ মিনিস্টারকে ফোন করে কাল থেকে আপনাদের সার্কিট হাউজে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি

এখন আমাদের গেস্ট। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলুন, গ্রীন হাউজে পেঁছে দিতে। ভাল হোটেল। আমি এখনই ওই হোটেলে ফোন করে দিচ্ছ।"

"ঠিক আছে। গ্রীন হাউজেই যাচ্ছি। হোটেলে লাগেজ নামিয়েই আপনাদের অফিসে পেঁছোচ্ছি। একটা কথা আক্রমণকারী কারা বলে আপনার ধারণা ?"

"মনে তো হয়, টি. এন ভি. গেরিলাদের কাজ। রাখছি আনন্দদা।"

ফোন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কাদম্বরী জিজ্ঞেস করলেন, "আক্রমণের কথা কী জিজ্ঞেস করছিলেন ?"

আক্রমণের কথা কানে যেতেই পিংকিও খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তবে কী আমাদের আনতে-যাওয়া গাড়িটাই ফেরার পথে আক্রান্ত হয়েছে ? বাবা কী করে এমন একটা সম্ভাবনার কথা অনুমান করেছিলেন ? এয়ারপোর্টেই কেউ কী বাবাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সব সময়ই তো বাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। এমন ধরনের কোনও ঘটনা আমার চোখ এড়িয়ে ঘটেছে বলে তো মনে হয় না ! তবে ? কাদম্বরীর সামনে এসব নিয়ে প্রশ্ন করা চলে না। কাদম্বরী অপরিচিতা, কে জানে ওই হয়তো গিরিমহারাজের এজেন্ট।

আনন্দবাবু কাদম্বরীকে বললেন, "দৈনিক বার্তার গাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছিল। কারা যেন গুলি চালিয়েছে।"

"গাড়িতে ক'জন ছিলেন ?" কাদম্বরীর গলা কেঁপে গেল।

"দু'জন। বোধহয় দু'জনেই মারা গেছেন। চলুন আপনাকে অপ্সরায় নামিয়ে দিয়ে আমরা গ্রীন হাউজে যাব। ওখানে সুটকেশ দুটো নামিয়েই আবার দৌড়ুতে হবে দৈনিক বার্তায়। আজ গ্রীন হাউজেই থাকছি। দেখি তারপর অমিতবিক্রম কী ব্যবস্থা করেন।" কথাগুলো কাদম্বরীকে বলে আনন্দবাবু ম্যানেজারের দিকে ঘুরলেন। অদ্ভুত এসব কথা শোনার পরও ম্যানেজারের মুখের রেখায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

"কত চার্জ দিতে হবে ?"

আনন্দবাবুর কথায় ম্যানেজার জানালেন, "না, না. চার্জ দিতে হবে না।"

অপ্সরা রবীন্দ্রভবনের কাছে। শহরে ঢোকার আগে বড় সিংহ-দরওয়াজা। দরজা পেরতেই ডাইনে চোখে পড়ল বিশাল প্রাসাদ। আনন্দবাবু বললেন, "দেখ পিংকি এটা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। এক বর্গ-কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এই প্রাসাদ। কত বছর আগে এটা তৈরি মনে হয় ?"

"আড়াইশো, তিনশো বছর হবে।"

'পরে, অবশ্য এমন ভাবাটা তোর পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নয়। মানুষ মাত্রেই বাড়িয়ে ভাবতে ভালবাসে। এটা মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ১৯০১ সালে তৈরি করিয়েছিলেন। ওর গায়ে যে সুন্দর মিউরাল দেখছিস, সেটা কে তৈরি করেছে বলতে পারিস ?"

রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো বসিয়ে আঁকা হয়েছে বিশাল এক ছবি অর্থাৎ মিউরাল। মিউরালের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই মনে পড়ল, গণেশ জেঠুর বাড়িতে এরই ড্রইং দেখেছিল, বলল, 'গণেশ জেঠু।'

কাদম্বরী বললেন, "ও কী গণেশ হালুইয়ের কথা বলছে ?"

আনন্দবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো দেখছি প্রচুর খবর রাখেন ?"

"হ্যাঁ, তবে আপনার মত নয়, এতবার এসেও জানতাম না উজ্জয়ন্ত প্রসাদ কে করিয়েছিলেন, কবে করিয়েছিলেন।" কাদম্বরী মুক্তোর মত দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন।

ট্যাক্সি বাঁয়ে মোড় ঘুরতেই ডাইনে পড়ল রবীন্দ্রভবন। রবীন্দ্র-ভবনের চারপাশে বিশাল জায়গা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ঘেরা জায়গাটায় ভবন ঘিরে নানা ধরনের বইয়ের স্টল তৈরির কাজ চলছে। বইমেলার উদ্বোধন হবে পরশু।

রবীন্দ্রভবন পার হলেই বাজার। ডাইনে চোখে পড়ল একটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বড়-সড় বাড়ি, বড় বড় হরফে লেখা সুদৃশ্য সাইনবোর্ড 'অপ্সরা।'

কাদম্বরীকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি আবার ফিরে চলল। সেই

রাজবাড়ি, সিংহ দরওয়াজা, সার্কিট হাউজ। এই এলাকাটা নির্জনতার জন্যই ভাল লাগে। আর একটু এগোতেই বাঁয়ে পড়ল কুঞ্জবন পোস্ট অফিস। তারপরেই তিনতলা হোটেল গ্রীন হাউজ। একতলায় ছিমছাম কাউন্টার, রিসেপসন কাউন্টার। কাউন্টারের ওপাশে বসে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের তরুণ কাজ করছিলেন। আনন্দবাবু ও পিংকিকে দেখে মুখ তুললেন।

"আমার নাম আনন্দ ঘোষ। দৈনিক বার্তা থেকে আমার সম্বন্ধে কোনও ফোন পেয়েছেন ?"

আনন্দবাবুর কথায় ছেলেটি বেরিয়ে এলেন কাউন্টার থেকে। "হ্যাঁ স্যার ফোন পেয়েছি। আমাদের হোটেলের মালিক শংকর ত্রিপুরা ও দৈনিক বার্তার অমিতবাবু খুব বন্ধু মানুষ, ফোন পেয়েই আপনার জন্য তিনতলার সেরা ঘরটা ঠিক করে রেখেছি। আপনি তো স্যার আমাদের গিরিমহারাজকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। দারুণ ব্যাপার স্যার। আপনার চ্যালেঞ্জে আমাদের আগরতলায় একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। আপনি তো স্যার আগামী কাল আসবেন শুনেছিলাম। আপনি আর গিরিমহারাজ তো কালকেই স্যার প্রেস ক্লাবে মিট্ করছেন। ক্লাবের হলটা যদিও বড়, তবু ওখানে বোধহয় কুলোবে না। খুব ভিড় হবে। আমার নাম স্যার দেবব্রত পাণিকা। মহারাজ বীরবিক্রম কলেজ থেকে গত বছর বি. এস সি পাশ করেছি।" একটানা ঝড়ের মত কথাগুলো বলে উত্তরের কোনও প্রত্যাশা না করে টগ্‌বগে যুবক দেবব্রত বার কয়েক ইলেকট্রিক বেল বাজাল।

হোটেলের রেজিস্টারটা এগিয়ে দিল দেবব্রত। আনন্দবাবু রেজিস্টার খাতাটা ফেরত দেওয়া পর্যন্ত কোনও বেয়ারার দেখা মিলল না। দেবব্রত আবার বেল টিপতে টিপতে বলল, "একটু আগেই দৈনিক বার্তার গাড়ির উপর গুলি চালিয়েছে টি. এন. ভি. গেরিলারা। দু'জন বুঝি মারা গেছে।" আরও কিছুক্ষণ হয়তো কথা চালিয়ে যেতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দু'দুটি বেয়ারা কথার মাঝখানে এসে হাজির হলো।

"স্যারের সুটকেস দুটো ২০ নম্বর রুমে নিয়ে যা।" কথাটা বলেই আনন্দবাবুর দিকে ফিরলেন দেবব্রত। "আপনি স্যার উপরে যান।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।" পিংকিকে দেখিয়ে বলল, "আপনার ছেলে স্যার?"

অন্যমনস্কভাবে আনন্দবাবু উত্তর ছুঁড়ে দিলেন, "হ্যাঁ।"

"আমি দেখেই বুঝেছিলাম। তোমার নাম কী ভাই?"

"পিনাকী, ডাক নাম পিংকি।"

২০ নম্বর ঘরটা খুব একটা বড় নয়। তবে আধুনিক কেতায় সাজান। কার্পেট বিছোন মেঝেতে দুটো সিঙ্গল খাট। খাট দুটোর মাঝে একটা ছোট টুল। টুলে কাঁচের অ্যাশট্রে। দেওয়ালে বসান ড্রেসিং টেবিল। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট ডাইনিং টেবিল। টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার। ঘরের এক কোণে একটা কাশ্মিরী টুল, টুলের ওপর মিনে করা একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ হলদে ও গেরুয়া রঙের গোলাপ, ঘরের পিছন দিকে লাগোয়া বারান্দায় দুটো অ্যালুমিনিয়ামের আরাম কেদারা।

সুটকেশ দুটো নামিয়ে রেখে বেয়ারা দু'জন অপেক্ষা করছিল। "এখন তোমরা এসো। দরকার হলে ডাকব।" বললেন আনন্দবাবু।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আনন্দবাবু দরজা বন্ধ করলেন। পিংকি চেয়ারে বসে জুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, "তোমার কী মনে হয়, টি. এন. ভি-র আক্রমণের লক্ষ্য আমরা না দৈনিক বার্তা?"

"তোর এমনটা মনে হল কেন?" আনন্দবাবু ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন।

"এখানে পা দিয়ে অবধি তোমার ব্যবহারে একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। দৈনিক বার্তার গাড়িতে উঠবে না ঠিক করেই তুমি দেবাঞ্জনকাকু, অমিতকাকুদের নজর এড়াতে এয়ারপোর্ট হোটেলে ঢুকেছিলে।"

আনন্দবাবু ফুলদানির দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ফুল খুব ভালবাসেন। ফ্ল্যাটের প্রতিটা ঘরে ফুল সাজান নিজের হাতে। এটা যে সাজিয়েছে, তার রুচির অভাব আছে। দু'রঙের ডজন খানেক গোলাপ এনে কোনও মতে গুঁজে দিয়ে কর্তব্য সেরেছে। এগুলোকেই যদি বিভিন্ন আকারে ডাল ছেঁটে সাজান যায়…।

মানিব্যাগের খাপে সব সময় ব্লেড থাকে। সেটাই বের করে ফ্লাওয়ার ভাস থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে টেবিলে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোর বুদ্ধিটা দেখছি বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। অনুমান শক্তির প্রশংসা না করে পারছি না, কিন্তু এখানে তোর অনুমান শক্তিটা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আগা-গোড়া ভুল করেছিস।" কথা বলতে বলতে আনন্দবাবু ফুল ছেড়ে প্যান্টের হিপ পকেটে হাত দিলেন, ছোট্ট ডাইরির একটা পাতা খুলে বুক পকেটের কলম দিয়ে দ্রুত লিখলেন, "আমাদের কথা কেউ শুনছে। স্বাভাবিক কথা চালিয়ে যা।"

ফুলগুলো আবার একইভাবে গুঁজে রাখলেন আনন্দবাবু। ফ্ল্যাওয়ার ভাসের ভেতর দিকে কালো ছোট বোতামের মত জিনিসটা যে একটা রিসিভার, এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি আনন্দবাবুর।

পোশাক পাল্টে একপ্রস্থ চা খেয়ে আনন্দবাবু বেরিয়ে পড়লেন পিংকিকে নিয়ে। পথে ফুলদানি রহস্যের খবর পেল পিংকি। কিছুটা এগুতেই একটা রিক্সা পাওয়া গেল। দৈনিক বার্তায় যখন পেঁছিলেন, তখন সেখানে বেশ ভিড়। একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে। ঢোকার মুখেই খবর পাওয়া গেল, ড্রাইভার রতন সাহা ও সাব-এডিটর মানিক দেব মারা গেছেন। মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

দোতলায় সম্পাদক অমিতবিক্রমের দেখা মিলল। মাঝারি উচ্চতা, বয়স চল্লিশের মধ্যে। পাতলা চেহারা। উজ্জ্বল দুটি চোখ। পরনে লুঙ্গির মত করে পরা ধবধবে সাদা ধুতি ও ফতুয়া। তিনতলায় অমিতের কোয়ার্টার।

বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে উত্তেজিতভাবে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন। সামনের চেয়ারে একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী।

ফোন করতে করতেই আনন্দবাবু ও পিংকির দিকে তাকিয়ে অমিতবাবু ইশারায় বসতে অনুরোধ করলেন। এক সময় ফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, "চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছিলাম। ইনি

সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিশ বীরচন্দ্র দেব। আর ইঁনিই সেই বিখ্যাত আনন্দ ঘোষ, গিরিমহারাজের চ্যালেঞ্জার। কাল আমাদের এখানে ঝড় তুলবেন। আর এ পিনাকী, আনন্দদার একমাত্র ছেলে।"

আলাপ-পরিচয়ের সুতো ছাড়ার মত সময় ছিল না, নমস্কার বিনিময়ের পরই অমিত মুখ খুললেন, "মিস্টার দেব, আমি আপনাকে প্রথম থেকেই বলে আসছি, আবারও বলছি আমাদের পত্রিকার উপর বা রতন সাহা ও মানিক দেবের উপর টি. এন. ভি. গেরিলাদের কোনও রকম আক্রোশ ছিল, এমনটা ভাবার মত আপাতগ্রাহ্য কোনও কারণ আমাদের চোখে পড়েনি।"

সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, "কারণটা আপনাদের চোখে না পড়ার অর্থ এই নয় যে কারণ নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, ওদের পরনে ছিল জলপাই সবুজ পোশাক, হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। ওদের বেপরোয়া গুলি চালনা দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় লুঠ বা বন্দী করা নয়, হত্যা করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।"

অমিত বললেন, 'আনন্দদা, তোমার ভাগ্য আজ খুব ভাল ছিল. সে সময় ওই গাড়িতে ছিলে না, অথচ গাড়িটা তোমাদের আনতেই গিয়েছিল।"

আনন্দবাবু বললেন, "জানই তো ভাগ্যে বিশ্বাস করি না...."

আনন্দবাবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বীরচন্দ্র আনন্দবাবুর দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। "আপনাদের আনতেই গাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। আপনি ও গাড়িতে এলেন না কেন?"

আনন্দবাবু ক্যাসেটের সাবধানবাণীর কথা জানালেন না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে গোপন বন্ধুটি বিপদে পড়তে পারেন, অথবা বন্ধুটি পরবর্তী বিপদের কথা জানতে পারলেও হয়তো সাবধান করার সুযোগ পাবেন না।

আনন্দবাবু বললেন, "ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল, বেরিয়ে দেবাঞ্জন বা অমিতবিক্রমকে না দেখে ভাবলাম, কোন কারণে এখনও ওদের গাড়ি এসে পেঁছোয়নি, অথবা আমাকে না দেখে গাড়ি ফিরে গেছে। তাই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছি।"

বীরচন্দ্র দেব এবার অমিতবিক্রমকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কী,

ধারণা, আনন্দবাবুর ওপর আক্রমণ চালানই টি. এন. ভি'র উদ্দেশ্য ছিল ?"

"না, আমি কিছুই বলছি না। বরং বিষয়টা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। কোথায় যেন একটা গড়বড় হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কোথায়, এখনি তা ধরতে পারছি না। আমাকে বেরুতে হবে। মানিক ও রতনের বাড়ি আমার একবার যাওয়া দরকার। আর, আনন্দদা, আমার সঙ্গে চীফ সেক্রেটারির কথা হয়েছে। সার্কিট হাউজে কাল থেকে একটা ডবল বেডের রুম তোমার নামে থাকবে, তুমি এখন কোথাও যাবে ?"

"ত্রিপুরা সংবাদের অফিসে একটু যাব ভাবছি।"

"চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এদের এডিটর সচ্চিদানন্দ সরকার একটু আগেই ফোন করেছিলেন। তুমি এসেছ শুনে কোথায় উঠেছ, জেনে নিলেন। এতক্ষণে গ্রীন হাউজে ফোন করে নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছে তুমি বেরিয়েছ। আমাদের পত্রিকার এক সাংবাদিক আজ দুপুর নাগাদ তোমার একটা ইণ্টারভিউ নিতে দেখা করলে অসুবিধে হবে ?"

"না, না, পাঠিয়ে দিও।" আনন্দবাবু দরাজ গলায় বললেন।

বীরচন্দ্র দেবও উঠে দাঁড়ালেন।

অমিত বললেন, "পিংকি আজ তো তাড়াহুড়োয় কিছুই খাওয়ানো হলো না।"

"আপনার গেস্ট হিসেবে গ্রীন হাউজেই তো খাচ্ছি।"

পিংকির কথায় হেসে ফেললেন অমিত।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তারা ত্রিপুরা সংবাদের অফিসে পেঁৗছে গেলেন। অমিত আর ঢুকলেন না। ছোট্ট একটি অফিস ঘর, তার পিছনেই ছাপাখানা। অফিস ঘরে একটা টেবিল, চারটে চেয়ার, একটা ফোন ও একটা বড় শক্তিশালী ব্যাটারীচালিত রেডিও। টেলিপ্রিণ্টার নেই। বুঝতে অসুবিধে হয় না, খবর সংগ্রহের ব্যাপারে টেলিপ্রিণ্টারের বদলে রেডিওকেই কাজে লাগান হয়।

অফিস ঘরে কেউ ছিলেন না। ভিতরের ঘরটা এখান থেকেই দেখা

যায়। দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা একমনে সীসের অক্ষরগুলো সাজিয়ে চলেছেন। তিনজনের সামনেই রয়েছে হাতে লেখা কাগজ।

আনন্দবাবুর ডাকাডাকিতে একজন পুরুষ বেরিয়ে এসে রাস্তার উল্টো দিকের তিনতলা বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, "ওটার দোতলায় সচীবাবু থাকেন। এখুনি বাড়ি গেছেন। পেয়ে যাবেন।"

বাড়িতেই পাওয়া গেল, মোটা-সোটা দিলখোলা মানুষ। পরনে ঢলঢলে প্যাণ্ট আর হাফ হাতার সার্ট। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। বিয়ে করেছেন বছর দশেক। কোনও সন্তান নেই। কাজপাগল মানুষ। নিজেই একাধারে সম্পাদক, সাংবাদিক, প্রুফরিডার সব।

আনন্দবাবুকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। বললেন, "গ্রীন হাউজে উঠেছেন শুনে আমি ফোন করেছিলাম।" স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "দীপ্তিও আমারই মত আপনার ভক্ত।"

শান্ত, শ্যামলা দীপ্তি হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন।

চা, আর গরম তেলেভাজার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। সচ্চিদানন্দই আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক। জানালেন, কালকের প্রেস কনফারেন্সের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। স্থানীয় বারোটা দৈনিকের প্রতিনিধিরা থাকছেন। রাজ্যের বাইরের পত্র-পত্রিকার আগরতলাস্থিত সাংবাদিক আছেন চোদ্দজন, তাঁরাও থাকছেন, অবশ্য বাইরের কিছু পত্র-পত্রিকার ও সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিরা আসবেন বলে আশা করছি। ত্রিপুরা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তিরিশটি। এ'দের প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি। মন্ত্রী, এম এল. এ-সহ আমন্ত্রিতের সংখ্যা একশো'র বেশি। আগরতলা মশাই আপনার চ্যালেঞ্জের জ্বরে থর থর কাঁপছে।

"আগরতলার মত ছোট্ট শহর থেকে এত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়?" আনন্দবাবু যথেষ্ট অবাক।

সচ্চিদানন্দ দুলে দুলে হাসলেন! "আগরতলার অনেক কিছুই আপনাকে অবাক করবে। গ্রীন হাউজের শংকর ত্রিপুরার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?"

"না এখনও হয়নি। কিন্তু রহস্যটা কী বলুন তো?"

সচ্চিদানন্দ মাথা দোলালেন, "একদম সাদা হাঙর মশাই, আগরতলায় ওর একগাদা বড় বড় কাপড়ের দোকান, ওষুধের দোকান। কাপড়ের দোকানগুলোতে অঢেল সিল্ক আর তাঁতের শাড়ির স্টক। এই গরীব রাজ্যে কেনে কে বলুন তো মশাই? অথচ রমরমা ব্যবসা চলছে। এ-রকম একটা গরীব রাজ্যে বড় লোকেদের বেশিরভাগই হয় কাপড়ের দোকানের নয় ওষুধের দোকানের মালিক। আসলে কী জানেন মশাই, এ-সব দোকানের প্রধান ক্রেতা বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা।"

এসব ব্যবসায়ীরা পাপমুক্ত হতে বিভিন্ন অবতারদের শিষ্য। গুরুদের মধ্যে গিরিমহারাজের রমরমা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং কাল রাত পর্যন্ত একটু সাবধানে থাকুন তো মশাই। এসব গোলমালে আপনি পিংকি না থাকলেই ভাল করতেন। আজ যদি আমি আপনাকে সাবধান না করে দিতাম, কী হতো, ভাবতে পারেন?"

"সতর্ক করে দিলেন মানে?" আনন্দবাবু চমকে উঠলেন।

"আপনি দৈনিক বার্তার গাড়িতে ওঠেননি কেন? ক্যাসেটটা শুনেই তো?"

"ক্যাসেটটা আপনি পাঠিয়েছিলেন?"

"আর বলেন কেন, আপনাকে আমরা কর্তা-গিন্নীতে ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তাই একটু ঝুঁকি নিলাম। ঝুঁকি অবশ্য কিছুই নয়, আমারই কলকাতার এক প্রকাশক বন্ধুকে ফোনে খবরটা দিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে চেনেন। নিজেই একটা ক্যাসেটে কথাগুলো রেকর্ড করেন আমার কথামত। তারপর আর কী আগরতলা বইমেলায় আপনারই ফ্লাইটে এসেছেন। সুযোগ মত আপনার কোটের পকেটে ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।" সচ্চিদানন্দ গলা ছেড়ে হাসলেন।

আনন্দবাবু আন্তরিকতার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, "গাড়িটাকে যখন আক্রমণই করবে জানতেন, তখন দৈনিক বার্তায় একটা ফোন করে দিলে দুটো প্রাণ বেঁচে যেত।"

সচ্চিদানন্দ মাথা দোলালেন, "না মশাই, আমি এটা ভাবতেই পারিনি, আপনি গাড়িতে না থাকলেও ওরা আক্রমণ চালাবে।"

"যারা আক্রমণ চালিয়েছিল তারা কারা?"

"টি. এন ভি. গেরিলা সাজা একদল পেশাদার খুনে। ওরা চায়

না আপনি গিরিমহারাজের মুখোমুখি হন। ওরা জানে, আপনি গিরিমহারাজের এমন একটা রমরমা ব্যবসায় লালবাতি জেবলে দিতে পারেন। আর সব বাবাদের মতই গিরিবাবাও আপনাকে ভয় খায়। যাই হোক কালকের দিনটা পর্যন্ত সাবধানে থাকবেন।"

"আজ উঠি। কাল তো শনিবার, ভাবছি সকালে গিরিমহারাজকে একবার দর্শন করে আসব। সঙ্গী হবেন নাকি?" আনন্দবাবু উঠতে উঠতে বললেন।

"সঙ্গী হতে আপত্তি নেই। কিন্তু কী জানেন মশাই, একা হাতে সব কাজ করতে হয়, সময় পাই না।"

"আনন্দবাবু রসিকতা করেই বললেন, "নাকি গিরিমহারাজের শত্রুর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে রাজি নন?"

"সে ভয় যে একেবারে নেই, তাও বলতে পারব না। আপনিও একটু সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন, যাঁর শত্রুতায় নেমেছেন তিনি প্রবল শক্তিশালী। ভক্তের সংখ্যাও বিশাল। ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রবল। কাল গেলেই দেখতে পাবেন, আশ্রম ঘিরে বিশাল মেলা বসে যায়। এগারোটা নাগাদ গিরিমহারাজ দর্শন দেন। বাঘের গুহায় আপনি হাত ঢুকিয়েছেন মশাই। বলি, মরতে আগরতলায় ওর শক্তি পরীক্ষায় রাজি হলেন কেন? নিরপেক্ষ কোন জায়গা কেন বেছে নিলেন না? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, এখানে ওর পরীক্ষা নেওয়ার আগেই আপনি খতম হয়ে যাবেন।"

"কী আর করি বলুন, উনি যে আগরতলা ছাড়া আর কোথাও অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে রাজি হলেন না। আর, যে ধরনের কাজ করি, তাতে মরার ভয় করলে চলে না। তাছাড়া, আমি তো একা নই। যেখানেই যাই, আপনার মত কিছু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ঠিকই পেয়ে যাই। যাই হোক, এবার চলি।"

সচ্চিদানন্দও উঠলেন, "চলুন তলা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।" কথা বলতে বলতে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অদ্ভুত তো?"

"কী হলো?" আনন্দবাবুও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে

তাকালেন, কিন্তু অবাক হওয়ার মত কিছু চোখে পড়ল না।

"আপনারা আসার একটু পরেই ইসমাইলকে অটো রিক্সো নিয়ে আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেছি। এখনও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দাঁড়ানোর পিছনে ওর কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা বুঝতে পারছি না। লোকটার গুণ্ডা হিসেবে বদনাম আছে। দাঁড়ান দেখছি।"

সচ্চিদানন্দ ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। "হ্যালো, নিত্য? শোন, রাস্তায় ইসমাইল অটো নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে সরাতে চাই। তুমি একটা ভারি ব্যাগ নিয়ে বের হও। ওর অটোতে দিলীপদার বাড়ি চলে যাও। ওখানে ওকে ছেড়ে দিয়ে একটু পরে তুমি ফিরে এসো।"

একটু পরেই ফোন বেজে উঠল। সচ্চিদানন্দ ফোন তুললেন, "নিত্য? বল। গেল না? ইঞ্জিনে গণ্ডগোল করছে বলছে?"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সচ্চিদানন্দ হাসলেন। "ভালই জমিয়েছেন দেখছি। চলুন, আপনাদের বরং কিছুটা এগিয়ে দিই। ইসমাইল এখনও নিশ্চয়ই ওর গাড়ির ইঞ্জিন নিয়ে খুট-খাট করছে। আমাদের দেখলেই ওর ইঞ্জিন ঠিক হয়ে যাবে।"

ইসমাইল যন্ত্রপাতি দিয়ে গাড়ির মেশিন-পত্তর নাড়াচাড়া করছিল। আনন্দবাবুদের এগোতে দেখে মেশিন-পত্তরগুলো ড্যাসবোর্ডে রেখে একটা ময়লা ন্যাকড়ায় দু'হাত মুছে উঠে দাঁড়াল, অটোতে স্টার্ট দিল। যেন পরীক্ষা করে দেখছে, স্টার্ট হয় কিনা।

আনন্দবাবু কাছাকাছি হতেই ইসমাইল জিজ্ঞেস করল, "যাবেন স্যার?"

সচ্চিদানন্দের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আনন্দবাবু হাত নেড়ে ইসমাইলকে অক্ষমতা জানালেন। একটু এগিয়েই আর একটা অটো পেয়ে যেতেই সচ্চিদানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অটোতে উঠলেন আনন্দবাবু ও পিংকি।

"গ্রীন হাউজ।" বলে আনন্দবাবু পকেটের ডাইরিটা বের করে চোখ বোলাতে লাগলেন।

পিছনে একটা অটোর শব্দ পেয়ে পিংকি মাথা বাড়িয়ে পিছনে

তাকাতেই দেখতে পেল ওদের পিছনে ইসমাইলের অটোটা আসছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই সার্কিট হাউজ পেরিয়ে এল অটোটা। এর পরই রাস্তাটা একেবারে নির্জন। হঠাৎ এক সময় ইসমাইলের অটো পিংকিদের অটোকে অতিক্রম করে রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল।

ইসমাইল এক লাফে নেমে এসে পিংকিদের ড্রাইভারের কলার চেপে ধরল। "তুই আমার সওয়ার তুলেছিস কেন রে ভোলা?"

পিংকিদের ড্রাইভার ভোলাও কম যায় না। মুহূর্তে দুজনে দস্তুর মত মারামারি শুরু করে দিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই দেখা গেল ইসমাইল ভোলার বুকের ওপর চেপে বসেছে, হাতে একটা চক্‌চকে ছোরা।

ভোলা প্রাণপণে ইসমাইলের ছোরা ধরা হাতের কব্জিটা ধরে প্রতিরোধের চেষ্টা চালাতে চালাতে চেঁচাল, "বাবু, আমাকে মেরে ফেলল, বাঁচান।"

আনন্দবাবু অটো ছেড়ে দ্রুত নেমে এলেন, সঙ্গে পিংকি। ইসমাইলের হাতের মুঠো থেকে ছোরাটা কেড়ে নিতে গেলেন আনন্দবাবু। আর সেই মুহূর্তে ইসমাইল ভোলাকে ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল। ইসমাইল ছুরিটা এবার বাগিয়ে ধরেছে আনন্দবাবুকে লক্ষ্য করে। আনন্দবাবু ইসমাইলকে সামলাতে দুটো পা আগু-পিছু করে হাতদুটো মুঠোবন্দী করে একজন মুষ্ঠিযোদ্ধার মতই দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই ভোলা ভল্ট খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দবাবুকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

আনন্দবাবু আই কু ডো'র প্যাঁচে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণ করার আগেই ইসমাইল প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুসি হাঁকড়াল আনন্দ-বাবুর পেটে।

"উ....ফ্....." একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো আনন্দবাবুর মুখ থেকে। ইসমাইলের দ্বিতীয় ঘুসিটা আনন্দবাবুর মুখ লক্ষ্য করে নেমে আসার আগেই পিংকি "আ-উ-স্" বুক কাঁপানো বিভৎস এক চিৎকার করে ক্যারাটের 'মাইগারি' চালাল। বুটজুতোর লাথিটা প্রচণ্ড শব্দে এসে আছড়ে পড়ল ইসমাইলের থুতনিতে। ঘাড় নড়বড়ে বুড়ো পুতুলের মতই ইসমাইলের মাথা দুলছিল। ইসমাইলের হাত

থেকে ছোরাটা ছিট্‌কে পড়েছে অনেক দূরে। ভোলা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর ঘাড়ের ওপর পিংকির ডান হাতটা কসাইয়ের ছুরির মতই এসে পড়ল। ভোলা কাটা কলাগাছের মতই পিংকির পায়ের কাছে পড়ে গেল। ইসমাইল ইতিমধ্যে আবার ছুরিটা তুলে নিয়েছে। পিংকিকে লক্ষ্য করে ছুরিটা বাগিয়ে ধরতেই এক মুহূর্তে পিংকি নীচু হয়ে রাস্তার ধুলো তুলে ছুঁড়ে দিল ইসমাইলের চোখ লক্ষ্য করে। ইসমাইল চোখ বুজল, আর ঠিক তখনই ইসমাইলের মাথায় পিংকির লাথিটা এসে পড়ল। প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। ইসমাইলের সমস্ত শরীরটা বার কয়েক থর থর করে কেঁপে উঠে স্হির হলো।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে মিনিট দু'য়েক লাগল। আনন্দবাবু অটো দুটোর নম্বর ডাইরিতে লিখে নিলেন, তারপর বাবা ছেলেতে পাশাপাশি এমনভাবে হেঁটে চললেন যেন কিছুই হয়নি।

কুঞ্জবন পোস্ট অফিস থেকে ফোনে সচ্চিদানন্দবাবুকে পথের সব ঘটনাটা জানালেন আনন্দবাবু, সেই সঙ্গে অটোর নম্বর দুটোও। ও প্রান্ত থেকে সচ্চিদানন্দ জানালেন, এক্ষুনি তিনি ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে ঘটনাটা জানাচ্ছেন।

দু'জনের স্নান করে দুপুরের খাওয়া সারারও কুড়ি মিনিট পরে এলেন এস. পি. বীরবিক্রম। বীরবিক্রমকে পেঁছে দিয়ে গেলেন দেবব্রত।

বীরবিক্রম খবরটা দিলেন, "রাস্তায় অটো দুটো পাওয়া গেছে, কিন্তু ইসমাইল বা ভোলা কাউকেই পাওয়া যায়নি। দু'জনের বাড়ি থেকেই খবর দিয়েছে, ওরা নাকি বাংলাদেশে গেছে। ওদের গাড়ি অন্যরা চালাচ্ছে। সচ্চিদানন্দবাবু অবশ্য বলেছেন, ইসমালকে উনি নিজের চোখে দেখেছেন, ভোলার অটোতেই আপনাদের তুলে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে ওদের বোধহয় বাংলাদেশেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।" আক্রমণের কথাটা জেনে এস. পি. সাহেবকে কিছুটা চিন্তিতই মনে হলো। জানালেন, একটু পরেই একজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের এসকর্ট হিসেবে।

বীরবিক্রম বিদায় নেওয়ার পর রাত পর্যন্ত আর কিছু অঘটন

ঘটেনি। জ্যোতি আদিত্য নামের এক তরুণ পুলিশ অফিসার পিংকিদের সঙ্গী হয়েছেন। দুপুরে দৈনিক বার্তা ছাড়াও আরও দুটি পত্রিকা থেকে আনন্দবাবুর ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে।

বিকেলে কাদম্বরী এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিলেন দাদা জন। ছ'ফুটের মত লম্বা, সুন্দর চেহারা, হাসিখুশি। বছর পঁয়তিরিশের তরুণ, ওঁরা দু'জনেই রাতে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাতে হয়তো অনেকেই আসবে, ভেবে আনন্দবাবু আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না।

বাস্তবিকই রাতে অনেকে এসেছিলেন। সাতটা দৈনিকের সাংবাদিকদের নিয়ে আনন্দবাবু একটা ছোটখাট সাংবাদিক সম্মেলনই সেরে নিলেন বলা যায়।

সকালে ওঠার তাড়া না থাকলেও সাড়ে ছ'টার বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলেন না আনন্দবাবু। পিংকিও উঠে পড়ল। ব্রেক ফাস্ট শেষ করতেই দেবাঞ্জন এলেন। দুটো খবর দিলেন। এক ঃ সার্কিট হাউজে রুম পাওয়া গেছে। গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন অমিতবিক্রম। লাগেজ সমেত আনন্দবাবুদের পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবেন। দুই ঃ আজ ভোররাতে শংকর ত্রিপুরাকে তাঁর বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে টি. এন. ভি. গেরিলারা। বাধা দিতে গিয়ে বাড়ির দারোয়ান আহত হয়েছে।

একটায় সচ্চিদানন্দ এলেন। জানালেন আর এক নতুন তথ্য, টি. এন. ভি-রা শংকর ত্রিপুরার একটি লিখিত স্বীকারোক্তি দৈনিক বার্তার অফিসে পৌঁছে দিয়েছে। তারই একটা কপি প্রেস ক্লাবেও পৌঁছে দিয়েছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। এতক্ষণে সব পত্রিকাই স্বীকারোক্তির কপি পেয়ে গেছে। আনন্দবাবুর হাতেও একটা কপি তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন।

ফটো কপিতে লেখা রয়েছে—

আমি শ্রীশংকর ত্রিপুরা, নিবাস—কুঞ্জবন, আগরতলা। আমার লোকদের দিয়ে গতকাল দৈনিক বার্তার গাড়ির উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিলাম, আমার লোকজনদের টি. এন. ভি'র পোশাক

পরিয়েছিলাম নিজে সন্দেহের ঊর্ধে থাকব বলে। আমি স্বেচ্ছায় এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। টি. এন. ভি.কে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিজেকে ত্রিপুরা পুলিশের হাতে সমর্পণ করব এবং কালকের আক্রমণকারীদের নাম পরিচয় প্রকাশ করব।

শ্রীশংকর ত্রিপুরা
২৮.২.৮৭

তিনটের সময় কাদম্বরী এলেন। আনন্দবাবু তখন উৎসাহী স্থানীয় কিছু সাংস্কৃতি সংস্থা ও বিজ্ঞান পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছিলেন, বা বলা যায় আড্ডা দিচ্ছিলেন।

কাদম্বরী পিছনের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে পিংকির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করে বিদায় নিলেন।

পাঁচটায় প্রেস কনফারেন্স। সাড়ে চারটেয় অমিতবিক্রমই এসে নিয়ে গেলেন পিংকি ও আনন্দবাবুকে।

চারটে চল্লিশ। আনন্দবাবু ও পিংকি প্রেস ক্লাবের দোতলার একটা ঘরে বসলেন। সচ্চিদানন্দ এসে জানালেন, "এখনি হল ভর্তি হয়ে গেছে। আরও একটা খবর, শংকর ত্রিপুরার এখনও হদিশ পাওয়া যায়নি।"

পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে গিরিমহারাজ এলেন। ফর্সা, গালভাঙা পাতলা চেহারা। সোনালী রঙের স্বল্প দাড়ি-গোঁফ। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল। সব মিলিয়ে যিশুর ছবির সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অমিলের মধ্যে, কপালে গোলা সিঁদুরের তিলক। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। আবার, মাথায় বাঁধা লাল রিবনটা যিশুর কাঁটার মুকুটের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সচ্চিদানন্দই দু'জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর বিনয়ের সঙ্গে গিরিমহারাজকে জানালেন, আপনার সঙ্গে আটটা গাড়িতে যে জনা পঞ্চাশ ভি. আই. পি. ভক্তরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও হলে দাঁড়াবার ব্যবস্থা অন্তত করা গেছে।

গিরিমহারাজ বার বার ঘাম মুছছেন দেখে আনন্দবাবুই উঠে গিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেন। তারপর নিজেই হৈ-চৈ করে আলাপ জমিয়ে দু-মিনিটেই জেনে নিলেন মহারাজের বয়স এখন চুয়ান্ন। আদি নিবাস চট্টগ্রাম। আগরতলায় আসেন বছর পঁচিশ আগে। সাধক জীবনের আগে নাম ছিল চিত্ত সরকার। ভৈরবী চণ্ডীমাতার কাছে দীক্ষা একুশ বছর বয়সে। আশ্রমে রয়েছে বগলাদেবীর মূর্তি। মা বগলার কৃপায় যে-কোনও মানুষের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান। যা কিছু করেন, সবই মায়ের কৃপায়। মায়ের ইচ্ছেতেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ। এখানে প্রমাণ করবেন, আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুহীন। সাংবাদিকদের সামনে আত্মাকে এনেই প্রমাণ করবেন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, অজ্ঞানতা।

পাঁচটার দু-মিনিট আগেই আনন্দবাবু ও গিরিমহারাজ হলে ঢুকলেন। চিত্র-সাংবাদিকদের ঘনঘন ফ্ল্যাশের ঝলকানির মধ্য দিয়ে দুজনে এগুলেন। হলের শেষ প্রান্তে টানা টেবিল, টেবিলের ওপারে গোটা সাতেক চেয়ার পাতা। দুজনকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন সচ্চিদানন্দ। দুজনেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন সাংবাদিকদের সামনে। আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বের জন্য আহ্বান জানালেন ত্রিপুরা সংবাদের সভাপতি সুভেন্দু দেববর্মাকে।

সুভেন্দু দেববর্মা সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে আগরতলা প্রেস ক্লাব নিজেদের যুক্ত করতে পেরে ধন্য মনে করছে।

গিরিমহারাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুভেন্দুবাবু বললেন, "আপনি কী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন সেটা খুবই সংক্ষেপে জানান।"

গিরিমহারাজ স্পিকারের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আজ ত্রিপুরাবাসীদের সৌভাগ্যের দিন। তাঁদের সামনেই প্রতিষ্ঠিত হবে আধ্যাত্মবাদের জয়। আনন্দবাবুর সঙ্গে বা তাঁর সমিতির সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ নেই। তাঁরা একটা ভাল কাজ করছেন। ধর্মের নামে যাঁরা লোক ঠকাচ্ছেন তাঁদের বুজরুকি এঁরা ফাঁস করছেন। ধর্ম একটা সাধনা, এটা বাজারের ফলমূল নয় যে ইচ্ছেমত যেখানে খুশি তুলে আনা যাবে। আমার মত সাধনা নিয়েই যাঁরা পড়ে

আছেন, তাঁদেরকে চ্যালেঞ্জ জানান চূড়ান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

আনন্দবাবুর নিশ্চয়ই স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটি পড়া নেই। থাকলে আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করতেন না। তিনি আর পাঁচজন বিজ্ঞানীর মতই যুক্তিবাদীদের মতই প্রমাণ ছাড়া স্বীকার করতে নারাজ, আত্মা অমর, মৃত্যুর পরেও আত্মারা ঘুরে বেড়ায়, প্ল্যানচেট করে বা তন্ত্র সাধনার সাহায্যে আত্মাদের এই নশ্বর পৃথিবীতে টেনেও আনা যায়, ভূতে পাওয়া মানুষের খবর আপনারা আমরা জানলেও আনন্দবাবুদের মত মানুষদের কাছে তা অজানা। আমি এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের পছন্দমত আত্মাকে নিয়ে আসব—এখানে—আবারও বলছি, এখানেই। সাধ্য থাকলে আনন্দবাবু আমার আত্মা আনা বন্ধ করুন।"

গিরিমহারাজ থামলেন। প্রচুর ছবি উঠেছে ইতিমধ্যে। অনেকেই তাঁদের টেপ-রেকর্ডারে শব্দ-বন্দী করে রাখলেন।

সুভেন্দুবাবু এবার বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানালেন আনন্দবাবুকে।

আনন্দবাবু সভার সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করলেন, "ধর্মের নামে লোক কারা ঠকাচ্ছেন, সেটা বুঝতে গেলে জানার প্রয়োজন ধর্ম কী? একটা তলোয়ারের ধর্ম তীক্ষ্মতা, আগুনের ধর্ম দহন, রকেটের ধর্ম ওড়া, ফ্রিজের ধর্ম ভিতরের জিনিসগুলোকে ঠাণ্ডা রাখা, মাধ্যাকর্ষণের ধর্ম আকর্ষণ করা, মানুষেরও তেমনি একটাই ধর্ম, সেটা হলো মনুষ্যত্বের চরমতম বিকাশ। সে বিচারে আমরা যুক্তিবাদীরা, বিজ্ঞানমনস্কারই আসল ধার্মিক। কারণ, আমরা চাই মানুষ সত্যকে বুঝতে শিখুক, জানতে শিখুক। আমরা চাই মানুষ কোনও অন্ধ বিশ্বাসে যেন বশ না হন। বহু মানুষ বা বিখ্যাত মানুষ মেনে নিয়েছেন, শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যেন কোনও ধারণাকে মেনে না নেন। আমরা চাই মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারপরই যেন কোনও কিছুকে গ্রহণ করুক বা বর্জন করুক।

হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে, রোগের কারণ পূর্বজন্মের কর্মফল বা অশুভ শক্তি। আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে. কোটি কোটি মানুষ

অন্ধ-বিশ্বাসে হাজার হাজার বছর ধরে শুধু ভুলই করে গিয়েছিলেন। আমাদের চোখে ধর্ম মানে শনি-সত্যনারায়ণের পুজো নয়, তাবিজ-মাদুলি নয়, মানবিকতাই আমাদের ধর্ম। আমরা চাই তথাকথিত ধর্মের নামে মানুষ ঠকানো ব্যবসা বন্ধ হোক। কেউ চাকরী না পেলে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলে, শিক্ষার সুযোগ না পেলে আমরা যদি এগুলোর জন্য নিজের ভাগ্যকে, আগের জন্মের কর্মফলকে দোষ দিই, তবে তো যাঁরা আমাদের দেশ শাসনের ভার পেয়েছেন তাঁরা দিনে দিনে অসৎ, অলসই হয়ে যাবেন। ভাববেন, ওইসব গরীবদের জন্য কিচ্ছুটি না করলেও তাঁরা সেজন্য আমাদের তো আর দায়ী করবেন না দায়ী করবেন নিজের ভাগ্যকেই। এর ফলে যাঁরা দেশ শাসনের নামে মানুষ ঠকিয়ে দু-পয়সা কামাতে চান, তাঁদের ভালই হবে।

মানুষ যদি বুঝতে পারে, তার বঞ্চনার পিছনে রয়েছে এদেশের কিছু মানুষ, ভাগ্য বা কর্মফল নয়, শুধু তবেই একদিন মানুষ ওইসব খারাপ লোকগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। আর এমনিভাবেই মানুষ সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচার অধিকার পেতে পারে।

গিরিমহারাজ বললেন, "স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটি পড়া নেই বলেই নাকি আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি। বিনীতভাবে জানাচ্ছি—বইটি আমার পড়া আছে, ভালভাবেই পড়া আছে। আর পড়া আছে বলেই জানাচ্ছি—স্বামী অভেদানন্দের যুক্তিকে মেনে নিলে, আত্মার যে মৃত্যু হয়, এটাও মেনে নিতে হয়।

অভেদানন্দের কথামত আত্মা মানেই 'চিন্তা', 'চেতনা', 'চৈতন্য' বা 'মন'। আমরা এখন স্কুল-কলেজে শরীর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ পাচ্ছি। আমরা যারা শরীর বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটুকুও নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি, তারা জানি, আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফলেই আমরা চিন্তা করতে পারি, আমরা ভাবতে পারি, আমাদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটে। এবার আপনারা একটু ভাবুন তো, যে মানুষটি মারা গেল তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোও মারা যাবে। এক সময় মস্তিষ্ক কোষগুলো আগুনে পুড়বে, অথবা মাটির সঙ্গেই মিশে যাবে। এরপর মৃত মানুষটির মস্তিষ্ক কোষেরই যেহেতু

অস্তিত্ব থাকছে না, তাই স্নায়ুকোষগুলোর কাজকর্ম করারও প্রশ্ন আসে না, প্রশ্ন আসে না মৃত মানুষগুলোর ভাবনা-চিন্তা করার। চিন্তাকেই যখন অভেদানন্দ বা অন্যান্য অবতাররা 'আত্মা' বলছেন, তখন সাধারণ যুক্তিতেই বোঝা যায় মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা, মন বা আত্মারও মৃত্যু ঘটে।

ভূতে-পাওয়া এক ধরনের মানসিক রোগ। যে-কোনও মনোরোগ চিকিৎসকরাই ভূতে-পাওয়া রোগীদের ঠিক করতে পারে। প্ল্যানচেটেও অনেক ধরনের ব্যাপার-স্যাপার আছে। কিন্তু সে নিয়ে এখন আলোচনায় গেলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে তাই চুপ করলাম ; তবে কখনও সময় সুযোগ পেলে আপনাদেরই বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে বোঝাবো।

এবার আমি গিরিমহারাজকে অনুরোধ করব, কীভাবে উনি আত্মা আনবেন সে বিষয়ে কিছু বলতে। তারপর ওঁকে অনুরোধ করব আত্মাকে এনে দেখাতে।"

গিরিমহারাজ উঠে দাঁড়ালেন এবার। তাঁর হাতের ইশারায় একজন শিষ্য এগিয়ে এসে গিরিমহারাজের হাতে তুলে দিলেন একটি শ্লেট, শ্লেটের পেন্সিল ও একটা বাটি। লোকটি সরে যেতেই গিরিমহারাজ বললেন, "এখানে রয়েছে একটি সাধারণ শ্লেট, শ্লেটে লেখার পেন্সিল ও একটা জলে-ভেজা স্পঞ্জের বাটি। এই তিনটির বেশি আর কিছুই আমি ব্যবহার করব না। আনন্দবাবু ইচ্ছে করলে জিনিস তিনটেই পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।"

এবার আনন্দবাবুর দিকে ঘিরে গিরিমহারাজ বললেন, "আনন্দবাবু, আপনি বরং পরীক্ষা করেই নিন।"

আনন্দবাবু আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন। এক-এক করে তিনটে জিনিসই নেড়েচেড়ে দেখে গিরিমহারাজের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, "কোনও কিছু দেখাবার আগে আপনাকে অবশ্যই বলে দিতে হবে, ঠিক কী আপনি দেখাবেন।"

গিরিমহারাজ এবার ভরপুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে খুশিখুশি মেজাজে মাথা দুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। অবশ্যই আপনি যেমনভাবে চাইবেন তেমনভাবেই পরীক্ষা দেব। আপনি যে-কোনও

একজন মৃতের নাম বলবেন। অবশ্যই এমন কোনও বিশিষ্ট মানুষের নাম বলবেন, যাঁদের স্বাক্ষর সম্বন্ধে আপনি ছাড়াও এখানে উপস্থিত অন্য দু-একজনও চেনেন। আমি সেই মৃতের আত্মাকেই নামিয়ে শ্লেটে স্বাক্ষর করাব।"

আনন্দবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মাকেই আনুন। উপস্থিত প্রায় সকলেই ওঁর স্বাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত।"

"বেশ, তাই হবে। আপনারা সকলেই এক মনে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ভাবতে চেষ্টা করুন, তাহলে তাঁর আত্মার উপস্থিতি সহজতর হবে।"

শ্লেট-পেন্সিল দিয়ে শ্লেটে আঁকিবুকি কেটে চলেছেন ও আপন মনে মাথা নাড়ছেন গিরিমহারাজ। সম্ভবত এভাবেই তিনি মনোসংযোগ করেন।

একসময় গিরিমহারাজ হঠাৎ প্রচণ্ড হুংকার ছেড়ে উঠলেন, "মা, মা-গো...."

গিরিমহারাজের চিৎকারে অনেকেরই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। অঘটনের আশঙ্কায় অনেকের হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হলো।

গিরিমহারাজ বললেন, "হয়েছে।" তারপর জলে-ভেজা স্পঞ্জটা দিয়ে শ্লেটে কাটা আঁকিবুকিগুলো মুছে ফেলে আনন্দবাবুর দিকে শ্লেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "কী শ্লেটে কোনও লেখা কৌশলে আগে থেকে লিখে রাখিনি তো? ইচ্ছে হলে আর একবার শ্লেটটা মুছে দিতে পারেন।"

আনন্দবাবু বললেন, "কোনও প্রয়োজন নেই।"

শ্লেটটা আনন্দবাবুর সামনে টেবিলের ওপর রেখে একটা খবর কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলেন গিরিমহারাজ।

আনন্দবাবু এবার দর্শক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনাদের কারও কাছে শ্লেট আছে?"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "আপনাদের কাছে না থাকলে আমি ছেলের কাছ থেকেই একটা শ্লেট চেয়ে নিচ্ছি।"

পিংকি তৎপরতার সঙ্গে একটা শ্লেট এগিয়ে দিল আনন্দবাবুর হাতে। আনন্দবাবু গিরিমহারাজকে বললেন, "শ্লেটটা আপনি পরীক্ষা

করে নিতে পারেন। গিরিমহারাজ অবজ্ঞার সঙ্গে হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বললেন, "ও ঠিক আছে, পরীক্ষা করতে হবে না।"

"আপনার পেন্সিল আর জলটা একটু দেবেন।" আনন্দবাবু অনুরোধ করলেন গিরিমহারাজকে।

গিরিমহারাজ দপ্ করে রেগে গেলেন। "ও সব আমি এখন তন্ত্র মতে সিদ্ধ করে নিয়েছি, আপনাকে দেব কেন? আপনি নিজেই একটা পেন্সিল আর একটু জল জোগাড় করে নিন না।"

আনন্দবাবুর ইশারায় পিংকি এগিয়ে এসে তুলে দিল একটা শ্লেটের পেন্সিল। আনন্দবাবু গিরিমহারাজকে বললেন, "আপনার স্পঞ্জটা ব্যবহার করতে অনুমতি দিবেন অনুগ্রহ করে?"

গিরিমহারাজ এবার আর রাগলেন না। উদার ভাবেই ভেজা স্পঞ্জের বাটিটা আনন্দবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। আনন্দবাবু এবার বললেন, "গিরিমহারাজ, আপনাকে আর একটি অনুরোধ, যে-কোনও একজন মৃতের নাম বলুন।"

"আমার দীক্ষাগুরু ভৈরবী চণ্ডী মাতা।"

আনন্দবাবু বললেন, "বেশ, বেশ।"

আনন্দবাবুও কিছুক্ষণ শ্লেটে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে চিৎকার করে উঠলেন, 'যুক্তিবাদ জিন্দাবাদ।"

গিরিমহারাজ বিরক্ত হলেন। বললেন, "এসব কী ছেলেমানুষী করছেন?"

আনন্দবাবু চোখ কপালে তুলে বললেম, "আপনি হুংকার দিয়ে মা'কে ডাকতে পারলে আমি হুংকার দিয়ে যুক্তিবাদের পক্ষে জয়ধ্বনি দিতে পারব না কেন?"

গিরিমহারাজ কথা না বাড়িয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। আনন্দবাবু স্পঞ্জটা দিয়ে শ্লেটের আঁকিবুকিগুলো মুছে দিয়ে গিরিমহারাজ ও দর্শকদের দেখিয়ে বললেন, "ঠিক মোছা হয়েছে তো?"

দর্শকদের অনেকেই কিছু মজা দেখার প্রত্যাশায় চেঁচালেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

আনন্দবাবু এবার শ্লেটটা গিরিমহারাজের সামনে টেবিলের উপর রেখে তার উপর একটা খবর কাগজ চাপা দিলেন। বললেন, "আমার

কাজ হয়ে গেছে, এবার দেখি গিরিমহারাজ কী দেখান।"

গিরিমহারাজ এবার থমথমে গলায় বললেন, "আমাকে নিয়ে রসিকতা করছেন আনন্দবাবু। তা করে নিন, কারণ একটু পরেই এই নির্মম রসিকতার পরিণতিটা ভালমতই টের পাবেন, যখন আপনার অহংভাব মায়ের কৃপায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এবার সবার কাছে একটিই অনুরোধ, আপনারা সকলে একটু চুপ করে বসুন। আমাকে মনঃসংযোগ করতে দিন। আত্মাকে আমি আনবোই।"

তারপর শুরু হলো প্রতীক্ষা। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, সকলেরই মনে কী হয়, কী হয়, ভাব!

মিনিট পঞ্চাশ পরে গিরিমহারাজের হল-কাঁপানো 'মা' ধ্বনিতে সকলেই চমকে উঠলেন। গিরিমহারাজ আনন্দবাবুকে বললেন, "আপনার শ্লেটটা তুলুন তো?"

আনন্দবাবু খবর কাগজের তলা থেকে শ্লেটটা বের করতেই গিরিমহারাজ প্রায় ছোঁ মেরেই শ্লেটটা টেনে নিয়ে দর্শকদের সামনে মেলে ধরলেন। কালো শ্লেটের বুকে জ্বলজ্বল করছে সাদা অক্ষরগুলো—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

জনচ্ছ্বাস যেন সামলানো যাচ্ছে না। ক্যামেরার ফ্ল্যাশগুলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অনবরত ঝলসে উঠছে। শিশুর মত নিষ্পাপ হাসি ছড়িয়ে এক হাতে শ্লেট ও আর এক হাতে বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গিরিমহারাজ।

গিরিমহারাজের শিষ্য ও ভক্তদের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে শুভেন্দুবাবু বার বার টেবিল চাপড়ে শেষ পর্যন্ত আনন্দবাবুকে বললেন, "গিরিমহারাজ যা দেখালেন, সে বিষয়ে কিছু বলবেন?"

আনন্দবাবু অবাক অবাক চোখে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই, আমার শ্লেটটা তো এখনও বের করাই হলো না। ওটা বার করুন, তারপর বলব।"

গিরিমহারাজ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খবর কাগজটা সরালেন। শুভেন্দুবাবু এবং আশেপাশের কয়েকজন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কিন্তু হায়, কোথায় কী? এ যে বেবাক কালো শ্লেট।

আনন্দবাবু বললেন, "শুভেন্দুবাবু, শ্লেটটা ওল্টান তো।"

শুভেন্দুবাবু শ্লেট ওল্টাতেই হলের সবাই মুহূর্তে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। কালো শ্লেটের বুকে গোটা গোটা স্পষ্ট হরফে লেখা আছে, "গিরিমহারাজ একজন বুজরুক, ইতি ভৈরবী চণ্ডী মাতা।"

এবার হলের উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের কলরোল। বাঁধ ভাঙা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন অনেকে। আবার সেই ফ্ল্যাশ, আবার সেই শ্লেট। তবে এবার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন আনন্দবাবু। পাশে পিংকি। আর ব্যাজার মুখে বসে আছেন গিরিমহারাজ।

শুভেন্দুবাবুই আবার টেবিল ঠুকে সকলকে শান্ত হতে আবেদন জানালেন। সাংবাদিকরা এবার ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, সকলেরই জানার আগ্রহ প্রধানত একটাই—কী কৌশলে এমনটা ঘটালেন?

আনন্দবাবু বললেন, "গিরিমহারাজের মত একই কৌশলে। আমার পেন্সিলটাও ছিল গিরিমহারাজের মতই অর্ধেক শ্লেট-পেন্সিল ও অর্ধেক সিলভার নাইট্রেট দিয়ে তৈরি। সিলভার নাইট্রেট সাদা হলেও বাতাসের সংস্পর্শে এলে রঙটা শ্লেট-পেন্সিলের মতই দেখায়। আমি ওর মতই পেন্সিল দিয়ে অনেক আঁকিবুকি কেটেছি, আর তারই ফাঁকে পেন্সিলটা উল্টে দিয়ে সিলভার নাইট্রেট দিয়ে লিখেছি—গিরিমহারাজ বুজরুক ইত্যাদি। স্পঞ্জে ছিল নুন জল। নুন জল দিয়ে মোছার ফলে প্রাথমিকভাবে লেখাগুলো মুছে গেলেও সিলভার নাইট্রেট ও নুন জলের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় সাদা সিলভার ক্লোরাইড—যা শুকিয়ে যাওয়ার পর শ্লেটের বুকে পরিষ্কার হরফে ফুটে ওঠে।

আনন্দবাবুর কথা শেষ করার আগেই এস. পি. বীরচন্দ্রদেবকে দেখা গেল গিরিমহারাজের পাশ ঘেঁসে দাঁড়াতে। সাদা পোশাকে থাকায় কখন যে এখানে এসে হাজির হয়েছেন অনেকেই খেয়াল করেননি। বীরচন্দ্র গম্ভীর গলায় যে কথাগুলো বলছিলেন, সেগুলোও মাইকের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা হলে।

"গিরিমহারাজ, কাল দৈনিক বার্তার দু'জন কর্মীকে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

এ ছাড়া আর অনেক অভিযোগই আপনার নামে আছে, তার মধ্যে একটা হলো আনন্দবাবু ও পিংকিকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা।"

গিরিমহারাজ ফুঁসে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাকের পুলিশরা।

"কী সব আজে-বাজে কথা বলছেন?" আর্তনাদের মতই শোনাল গিরিমহারাজের গলা।

বীরচন্দ্র বললেন, "শংকর ত্রিপুরা আত্মসমর্পণ করেছে। তার লিখিত বয়ান অনুসারে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

আবার ফ্ল্যাশ চমকে উঠতে লাগল; কারণ এবার বীরচন্দ্র হাতকড়া পরাচ্ছিলেন গিরিমহারাজকে।

রাত আটটা, সার্কিট হাউজে বিশাল ভিড়। প্রচুর ফুলের তোড়া জমেছে। সচ্চিদানন্দবাবু একটা পার্কার পেন পিংকির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এটা আমার প্রিয় পেন, তোমার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দিলাম।"

পিংকি কলমটা কাদম্বরীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এবারের কৃতিত্বের অনেকটাই কিন্তু কাদম্বরী আন্টিরই প্রাপ্য। তিনি আজ দুপুরে সার্কিট হাউজে এসে আমাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন, গিরিমহারাজের জন্য ওর দাদা এক ধরনের শ্লেট ও পেন্সিল তৈরি করেছেন। গিরিমহারাজের লোক আজ সকালে এসেছিল ডেলিভারি নিতে। লোকটাকে দুপুরে আসতে বলেছিলেন ওর দাদা। দাদার অজ্ঞাতে সেই পেন্সিলেরই একটা চুরি করেছিলেন কাদম্বরী। সেই চোরাই মালটাই আজ দুপুরে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।"

কাদম্বরী পিংকির হাত থেকে কলমটা পরম মমতায়, পরম যত্নে গ্রহণ করলেন। ওর মুখে হাসি, চোখে চিকচিক করছে জল।

———